ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৭ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৪২৯

স্বাধীনতা-উত্তর কবিতায় মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

*মোঃ রশিদুল ইসলাম

সারসংক্ষেপ: দেশের মুক্তির জন্য সংঘটিত হয় নয় মাসব্যাপী সশস্ত্র যুদ্ধ। ১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালি বিজয় ও স্বাধীন সার্বভৌম দেশ অর্জন করে। জাতির জন্ম ও বিকাশের এই ইতিহাস ও ঐতিহ্য বাংলাদেশের কবিরা ধারণ করেন। সকালের সূর্যোদয়ের মতো সুন্দর বাংলাদেশ যা রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে লিখেছেন অনেক সংগ্রামী কবি। দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন এবং বাস্তবতা শেষ পর্যন্ত রূপ লাভ করে সফলতায় যা বাংলাদেশের কবিতায় উপস্থাপিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে ৭১-এর ধ্বংসযজ্ঞ, স্মৃতিচারণ ও সংশয়, সত্তর দশকের কবিতায় বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গ, প্রতিরোধচেতনা, পাকিস্তান-প্রসঙ্গ, স্বপ্নভঙ্গ ও হতাশা, সংগ্রামের স্মৃতি, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা ও উত্তোলিত তর্জনী প্রসঙ্গ, যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সামাজিক চিত্র প্রভৃতি বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ এবং এর সাথে সম্পৃক্ত শব্দগুলো যুদ্ধ-পরবর্তী কবিদের কাছে কবিতা লেখার নতুন পবিত্রভূমি ও নবতর উপাদান হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। প্রবন্ধটি গবেষণায় তুলনামূলক আলোচনা ও পাঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

প্রাক-কথা

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হলো বাংলাদেশ। ঔপনিবেশিক কালে যে জনপদ উপেক্ষা, অবহেলা, শোষণ ও বঞ্চনার জলাভূমির মধ্যে গড়ে উঠেছিল সে জনপদ স্বাধীনতার স্বাদ মুখে নিয়ে আত্মপরিচয়ে দাঁড়াবার সক্ষমতা অর্জন করল। অর্থনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি ও রাজনীতির স্বাধীন বিকাশের সুযোগও এল, যে প্রত্যাশা ও স্বপ্ন এদেশের জনগণকে জাগ্রত করেছিল মুক্তিযুদ্ধে, স্বাধীন বাংলাদেশ তা পূরণে ব্যর্থ হলো। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ সামাজিকভাবে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। মুক্তিযুদ্ধে ২৩ লক্ষ বাড়ি-ঘর ধ্বংস ও ১০ লক্ষ আংশিকভাবে বিনষ্ট হবার ফলে বাসস্থান সংকট দেখা দেয়। ৪০ হাজার শিশু এতিম হয় এবং অসংখ্য পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষের মৃত্যুর ফলে পুরো পরিবার বিপর্যস্ত হয় [দৈনিক বাংলা, ৮ জানুয়ারি, ১৯৭৩]। মানবিক ও সামাজিক সংকট সৃষ্টি হয় এবং অপরাধমূলক তৎপরতা বেড়ে যায়। সামাজিক এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে অর্থনীতি ও রাজনীতিতে সুযোগসন্ধানী শ্রেণির উত্থান ঘটে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালের বন্যা অর্থনীতিতে চূড়ান্ত বিপর্যয় ডেকে আনে, দ্রব্যমূল্য পায় ভয়াবহ উর্ধ্বগতি। মজুদদার ও চোরাকারবারিরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। প্রশাসন কার্যকারিতা হারাতে থাকে। দুর্নীতির প্রসার ঘটে সীমাহীন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাত থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত কালপর্বে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয় ভয়াবহ রাজনৈতিক হত্যাযজ্ঞ। ১৫ আগস্টের রাতে সপরিবার হত্যা করা হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ৩ নভেম্বর কেন্দ্রীয় কারাগারে খুন হন তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলি ও এএইচএম কামারুজ্জামান চার জাতীয় নেতা, যাঁরা ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধান সংগঠক। এরপর সেনা অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থান শেষে ৭ নভেম্বর নিহত হন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। বস্তুত, '১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত সময়টি ছিল অরাজকতাপর্ব। এ প্রসঙ্গে হিমেল বরকতের মন্তব্য–

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পঞ্চগড় সরকারি মহিলা কলেজ, পঞ্চগড়

> এ সময়ে রচিত কবিতায় নতুন রাষ্ট্র-পতাকা-স্বাধীনতা প্রাপ্তির উল্লাস যেমন আছে, একই সঙ্গে আছে স্বজন বিয়োগের যন্ত্রণাও। আরো উল্লেখ যে, মুক্তিযুদ্ধের মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই পরাজিত পাকিস্তানি দোসরদের উত্থান ও পুনর্বাসন কবিদের মর্মাহত করেছে। স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় কবিরা বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। এর সঙ্গে চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ, গণমানুষের দুরাবস্থা, ক্ষমতালোভীদের দাপট, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, সামরিক ক্যু অর্থাৎ সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থির টালমাটাল আর্থ-রাজনৈতিক বিপন্নতা কবিদের সোচ্চার করে তুলেছে। সত্তরের কোন কবিই সময়ের এই উত্তাপ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারেনি।[১]

সত্তরের কবিতায় শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তাই বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় যুদ্ধ, ধ্বংস, রক্তপাত, নির্যাতন, অস্ত্র, দুর্ভিক্ষ, শোষণ, স্বপ্ন, সংগ্রাম, মিছিল, ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয়ক শব্দাবলি। 'সত্তরের কবিতায় শব্দ বিশেষ বৈশিষ্ট্যরূপে শনাক্তযোগ্য– পতাকা, মানচিত্র, মুক্তি, স্বাধীনতা, শহিদ, বঙ্গবন্ধু, ক্রন্দন, আর্তনাদ, আত্মত্যাগ, চিৎকার, রক্ত, রাইফেল, আগুন, গেরিলা, গুলি, বাংকার, গ্রেনেড, বারুদ, লাশ, মুক্তিযোদ্ধা, গণকবর, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, রাজাকার, উদ্বাস্তু, ঘাতক, শকুন, কুকুর, কাক, মন্বন্তর, রাজপথ অন্ধকার। স্বাধীনতা-প্রাপ্তি ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে অবলম্বন করেই মূলত এসব শব্দের ব্যাপক ব্যবহার সত্তরের কবিতাকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়।

সত্তরের দশকে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম থেকেও আঁচ পাওয়া যায় এ সময়ের উত্তাপ। সিকান্দার আবু জাফর লিখেছেন *বাংলা ছাড়ো* (১৯৭২), শামসুর রাহমান লিখেছেন *নিজবাসভূমে* (১৯৭০), *বন্দী শিবির থেকে* (১৯৭২) প্রভৃতি। আলাউদ্দিন আল আজাদের *লেলিহান পাণ্ডুলিপি* (১৯৭৫), হাসান হাফিজুর রহমানের *যখন উদ্যত সঙ্গীন* (১৯৭২), আল মাহমুদের *সোনালী কাবিন* (১৯৭৩), শহীদ কাদরীর *তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা* (১৯৭৪), আবুল হাসানের *রাজা যায় রাজা আসে* (১৯৭২), নির্মলেন্দু গুণের *প্রেমাংশুর রক্ত চাই* (১৯৭০), রফিক আজাদের *চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া* (১৯৭৭), রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর *উপদ্রুত উপকূল* (১৯৭৯) প্রভৃতি। দেশ, স্বাধীনতা, ঐতিহ্য, সংগ্রাম হতাশার বিস্তৃত পরিসর এসব নামকরণের ভেতর দিয়ে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। শামসুর রাহমানের *বন্দী শিবির থেকে*, হাসান হাফিজুর রহমানের *যখন উদ্যত সঙ্গীন* গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধকালে রচিত কবিতার সন্ধান পাই।

৭১-এ ধ্বংসযজ্ঞ, স্মৃতিচারণ ও সংশয়

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৯৩৪-২০০১) রচিত *কমলের চোখ* কবিতায় সুঠাম দেহ কমলের প্রসঙ্গ এসেছে তাঁর ডান চোখ বুলেট দিয়ে ছিঁড়ে গেছে। সুবর্ণ গ্রামের উঠানে এবং দাওয়ায় পুকুরঘাটে রমণীর নগ্ন শরীর জ্যোৎস্না প্লাবিত অন্ধকারে তার আশ্রয় অথবা কেউ গলায় ফাঁস দিয়ে মারা গেছে। হানাদারদের বুলেটে বিদ্ধ হয়ে বন্ধু কিংবা সচেতন মানুষের হৃদপিণ্ড কুকুর বা শেয়াল খেয়ে পলাতক। কবির ভাষায়-

> একটা বুলেট
> কমলের ডান চোখ
> ছিঁড়ে নিয়ে গেছে।[২]

সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) *গেরিলা* কবিতায় গেরিলারা দিগন্তে নতুন মাস্তুল এবং পিতৃপুরুষের চিত্রিত দণ্ড ধরে একাকি জনশূন্য জনপদে উজ্জ্বল এক চিতার মতো দাউ দাউ

নাপামের মধ্যে হেঁটে যাওয়ার চিত্র অংকন করেছেন। ইস্পাতের সরল নল হয়ে যায় পিস্তল যা বর্ণনা করা হয়েছে *বস্তুর আকার* কবিতায়। *জগন্নাথ হল* নামক কবিতায় ছাত্ররা উধাও, ফুলেরা অজস্র পতাকা এবং ঘাসগুলো যেন বেয়নেট অথচ পাশেই পড়ে আছে ছিন্ন একটা স্তনের বোটা যা নিস্তব্ধতা ও দীর্ঘ ছায়া ফেলে দেয়। *শূন্য পটভূমিতে শূন্যতার স্থিরচিত্র* কবিতায় শহরে স্তব্ধ হাহাকার এবং গ্রেফতারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। *বেজান শহরের জন্য কোরাস* কবিতায় শহর বা দেশের পুরাতন উপকথাগুলো, ভাষণ এবং উচ্চারণগুলো উদ্ধার করে কোরাস সাজিয়ে পাখির দলের মতো উড়িয়ে দেওয়া বা মাছের ঝাঁকের মতো ছেড়ে দিতে বলেছেন। সাজিয়ে নেয়া কোরাস অনলের মতো জ্বালিয়ে পাথরে পরিণত হওয়া সবকিছুকে স্বরূপে ফিরে আনবে। নিজেদের মধ্যে ভয় এবং ত্রাস থাকবে না। হাতে হাত ধরে পুরাতন স্মৃতিকে উদ্ধার করে অন্তর্গত পাথর এবং ত্রাসকে কুঠার দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করার কথা বলেছেন। তাঁর *এই ঘণ্টাধ্বনি* কবিতায় বর্ণনা এসেছে দুই ভাইয়ের রাস্তায় পড়ে থাকা রক্তাক্ত জামাসহ দেহ, যুদ্ধার্থীর বন্দুক থেকে বের হওয়া গুলি এবং নিজ দেহের ওপর সার্চলাইটের আলো পতিত হওয়া। যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত লোকটি পিস্তলের গুলিতে লুটিয়ে পড়ার দৃশ্যও রয়েছে কবিতাটিতে। সৈয়দ শামসুল হক *ব্রহ্মপুত্রের প্রতি* কবিতায় ত্রিশ লক্ষ মানুষের রক্তদান, দশ লক্ষ ধর্ষিতার আর্তনাদ, তিন কোটি মানুষের গৃহত্যাগ এবং বলীবর্দের দ্বিখণ্ডিত খুরে কম্পমান স্বপ্নের কথা বর্ণনা করেছেন। সৈয়দ শামসুল হক *আর কত রক্তের দরকার হবে* কবিতায় প্রথম উচ্চারিত শব্দ মা কথাটির জন্য রফিক, সালাম, বরকত সহ নাম না জানা অনেকে রক্ত দিয়েছেন। হাজার হাজার জহুর, জয়নাল, শামসুজ্জোহা রক্ত দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু সহ আরো অনেকে নিজের রক্ত দিয়ে মা কথাটি লিখে গিয়েছেন। কবির প্রশ্ন মা কথাটি লেখার জন্য এই দেশে আর কত রক্তের দরকার হবে যাতে আর কেউ মা কথাটি মুছে ফেলতে না পারে।

জুলফিকার মতিন (১৯৪৬-) *অন্য রকম প্রেমিক*, *শোকের নক্সী মাঠ*, *দণ্ডিত ও মুক্তিযুদ্ধের কবিতা* রচনা করেন। *কারফিউ*, *ধর্ষিতা নারীর দেহ*, *শবদেহ*, *হত্যা*, *দগ্ধীভূত ঘরবাড়ি* প্রভৃতি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে তাঁর কবিতায়। কবি লিখেন *মুক্তিযুদ্ধের কবিতায়*—

তছনছ সারাদেশে — দারুণ আগুনে
দগ্ধীভূত ঘরবাড়ি, মৃত শিশু পশু
জ্বলন্ত অনলে সিদ্ধ ধর্ষিতা নারী
আগুনের লেলিহান স্ফুলিঙ্গ মালা
লকলকে জিহ্বা মেলে মূঢ় স্পর্ধায়
আকাশ পোড়াতে চায় পোড়া গন্ধ ভাসে
বিকৃত গলিত শব শকুনি পাহারা
যেন কোন নরকের উন্মুক্ত দুয়ার
নির্বিকার প্রতিকল্পে বিপন্ন বিতান।[৩]

আবিদ আনোয়ার (১৯৫০-) ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারতের বিহারে অবস্থিত চাকুলিয়া ক্যাম্প থেকে বিশেষ কমান্ডো হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়ে ৩ নম্বর সেক্টরের অধীনে মুক্তিযুদ্ধ করেন। কিশোরগঞ্জ এলাকায় ধূলদিয়া রেলসেতু অপারেশন এবং ভাঙা সেতুর পাড়ে পরবর্তী যুদ্ধ পরিচালনায় তিনি প্রভূত সাফল্য প্রদর্শন করেন (bn.wikipedia.org./wiki/ আবিদ আনোয়ার)। আবিদ আনোয়ার মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি এবং জেনারেল টিক্কা খানের উদ্দেশ্যে

যথাক্রমে *প্রতিরোধ* ও *দ্রব্যগুণ*, কবিতা দুটি রচনা করেন। পাকিস্তানি শকুনিদের চিৎকার আর বুটের প্রতাপে তারার মতো শব পড়ে আছে বধ্যভূমিতে, আর পাকসেনাদের হাতে বন্দি এবং প্রেয়সীর শাড়ি দিগন্তে রঞ্জিত হয়ে ওড়ে, পেটিকোট নিয়ে কাড়াকাড়ি করে শৃগাল এবং কুকুর, পিষ্ট হয়ে যায় কাঁচুলি দানবের হাতে। তাই শত্রুকে হত্যার জন্য নাবালক কিশোরীটিও রণসজ্জায় মনসার মেয়ের মতো লকলকে লাউয়ের ডগার মতো সম্মুখে উপস্থিত। যেমন:

ছায়া পথে দোলে প্রেয়সীর মুখ
দিগন্তে ওড়ে রঞ্জিত তার শাড়ি
পেটিকোট নিয়ে কাড়াকাড়ি করে
শৃগাল কুকুর শিবিরে শিবিরে
পিস্ট কাঁচুলি দানবের করতলে
গোখরোর মতো ফণা তুলে আসে
মনসার মেয়ে- লকলকে লাউডগা।[৪]

সৈয়দ হায়দার (১৯৫০-) *কেন মুক্তিযুদ্ধ* কবিতায় বাংলার মানুষের সুজলা সুফলা ভূমি, সুখভোগ, ধর্মচর্চা, কৃষিকাজ, কাতলা মাছের চাষ, সোনালি আশের গাঁট, গরুর বাথান, ভরা হাট, সরল জীবন প্রভৃতির বর্ণনা এসেছে। এমনি পরিবেশে পশ্চিম পাকিস্তানিরা এসে শুরু করল ধর্ষণ, হত্যা। শিহাব সরকার (১৯৫২) রচিত *তোমার রক্তের ঋণ* কবিতায় রক্তে অর্জিত বাংলায় জন্ম নেয়া শিশু কখনো রক্ত ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না এবং *টুকরো টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গার* কবিতায় পশ্চিম পাকিস্তানি নিষ্পাপ পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণের মতো আমাদের শিশুরাও নিষ্পাপ ছিল কিন্তু গর্ভবতী মায়েদের ধর্ষণ করে এবং বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারে পাকিস্তানি হানাদারেরা- এভাবে শোষণ, অত্যাচার, হত্যা পূর্ব পাকিস্তানিদের মনে ক্ষোভের জন্ম দেয় এবং পরবর্তীতে যুদ্ধ করার ঐক্য তৈরি হয় পূর্ব পাকিস্তানিদের। যেমন:

উদ্ধত শিশুর চিৎকারে ছিড়ে গেছে মাতৃযোনি
এসব টুকরো টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গার
মধুর সর্বনাশের মতো তোমার এবং আমাদের সকলের
স্বপ্নের পদ্মা ও যমুনায় রক্তজবার ঝড় তুলেছিল।[৫]

হালিম আজাদ (১৯৫৫-) *মনে আছে কি* কবিতায় মুক্তিযুদ্ধকালীন স্মৃতির বর্ণনা করেছেন। বন, মরুভূমি, শ্মশানপথ পেরিয়ে শহরে লাশের স্তূপ দেখতে দেখতে পার হওয়া, শিশু ও নারীর দুঃখ, বাচ্চার দুঃখ, ঘুমের দুঃখ প্রভৃতি বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। ঠিক এমন সময়ে বাউল দেশে ঘরবাড়ি, আপনজনহীন নির্বাসন নিয়ে পাহাড়ের সঙ্গী, যুদ্ধের মহড়ায় নয় মাস যুদ্ধ। বুলেটের মুখে, বোমার তাড়নায়-আগুনের লেলিহানে, বেয়নেটের খোঁচায়, রক্তের বন্যায় একাকার হয়েছিলেন এবং চাঁদের মতো বোনকে শত্রুর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন সেইসব স্মৃতির কথা মনে আছে কিনা, এটাই কবির দ্বিধা-

বুলেটের মুখে
বোমার তাড়নায়
আগুনের লেলিহানে
বেয়নেটের খোঁচায়
রক্তের বন্যায়
একাকার হয়েছিলাম। চাঁদের মতো বোনকে শত্রুর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম

তোমার কি এইসব মনে আছে।[৬]

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (১৯৫৬-১৯৯১) রচিত *হাড়েরও ঘরখানি* কবিতাটিতে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে বর্ণিত আছে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা এবং মুক্তিযুদ্ধের শুরুর কথা। রাখালের বাঁশি, পাখির ডাক এমন কি রাজপথে কাকের ডাক পর্যন্ত শোনা গেল না। সাতপুরুষের স্মৃতি, স্বজনের লাশ, উনুনের হাঁড়ি ছেড়ে মানুষ পালাতে লাগল। বন্ধুর লাশ কাঁধে ফেরা, ধর্ষিতা বোনের শকুনে ছিঁড়ে খাওয়া দেহ, তেমাথায় শুধু ব্যথিত কুকুরের কাঁদা এসব স্মৃতিতে ভাসে। হাতে গ্রেনেডের লুকানো বিস্ফোরণের জ্বালা জ্বলন্ত বুকে, গেরিলারা রক্তের শোধ নিয়ে তখত অধিকার করবে এবং সমতার দিন আসবেই এমন স্মৃতিতে রচিত কবিতাটি।

নাসিমা সুলতানা (১৯৫৭-১৯৯৭) তার *রণক্ষেত্র ও সম্পূর্ণ মানুষ* কবিতায় একজন নারী যে যুদ্ধে যায়নি অথচ পাকিস্তানি জলপাই রঙের গাড়িতে সবুজ হেলমেট পরা সৈনিকের ধর্ষণের শিকার হয়। যে মেয়েটি দাঁতে কেটে নিত ধানের শিষ, কাঁশফুল ছুঁয়ে দিত এখন সে কাঁদে আর গাছের গুড়ির ফাঁকে নিজেকে লুকায়। কালীপদ নামক ব্যক্তির সান্ত্বনায় স্মৃতিতে ভেসে ওঠে––

তুমিও সান্ত্বনা দিলে কালীপদ?
আমার শরীরে এত নখের আঁচড়
শকুনির চঞ্চুতে খুবলে নেওয়া মাংসের হাঁ
জল-ভাত-মাটির লড়াইয়ে আমি নেমে যাই তবু কিসের জন্যে?[৭]

সোহরাব হাসানের (১৯৫৫-) *বাংলাদেশ* নামক কবিতায় বর্ণিত হয়েছে চারদিকে ধ্বংস, অধঃপাত মৃত্যুর *বিনাশী গান, শোক, জরা, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, সাইক্লোন* প্রভৃতি। ধান, জমি, প্রিয় ঘর থাকা সত্ত্বেও না পাওয়ার ব্যর্থ চিৎকার। কবির দৃষ্টিতে দক্ষিণের সাগর, উত্তরে পাহাড় কল্যাণের জন্য, তবুও কল্যাণ আসেনি। এ দেশে শুধু দুঃস্বপ্ন, মনোহর পাখি পর্যন্ত গান জানে না এবং এদেশের নদীবক্ষে লাশ হয়ে যায়। কৃষক, শ্রমিক, শিশু, নুলো ভিখিরি পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এই হলো এশিয়ার বুকে স্বদেশের ধুঁকে মরার চিত্র। যেমন:

চতুর্দিকে শোক, জরা দুর্ভিক্ষের করুণ মিছিল
কেবল মন্বন্তর, মহামারী, সাইক্লোন
উন্মত্ত ধ্বংসের সর্বগ্রাসী থাবা
হায়, এই দেশে জান্তার কালো বুটে মাপা হয়
জমির উর্বরতা।[৮]

আবুল হাসান (১৯৪৭-১৯৭৫) রচিত *উচ্চারণগুলি শোকের* কবিতায় একটি সুন্দর সাজানো সংসারের কথা বলা হয়েছে যেখানে *লক্ষ্মী বউ, হাঁটি হাঁটি শিশু, ছোট ভাই* এবং *নরম নোলক* পরা বোন রয়েছে। অথচ মুক্তিযুদ্ধ শেষে স্মৃতিতে কবি *লক্ষ্মী* বউকে রাজহাঁস, হাঁটি হাঁটি শিশু, সবুজ আকাশ কিংবা সবুজ মাঠের সূর্য, ছোট ভাই যেন স্বাধীন পতাকা এবং ছোট বোনটিকে তিমিরের বেদিতে উৎসবের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেমন:

তবে কি আমার ভাই আজ ওই স্বাধীন পতাকা
তবে কি আমার বোন তিমিরের বেদিতে উৎসব।[৯]

আবার *গ্রেনেড* কবিতায় তিনি ক্রোধের জন্য ক্রোধ নয় বরং আমাদের দেশের মুক্তিযোদ্ধারা ভালোবেসে ভালোবাসার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে কবিতাটিতে। যেমন:

ক্রোধের জন্যই ক্রোধ নয়
আমি যুদ্ধ করেছিলাম ভালোবাসার জন্যে
রক্তপাতের জন্যই রক্তপাত নয়
আমি ভালবাসার জন্যে কণ্ঠনালী দিয়ে টেনে তুলে

হাতের মুঠোর মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম গ্রেনেড।[১০]

সত্তর দশকের কবিতায় বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গ

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান দিয়েছিলেন বাঙালির মুক্তির ডাক, সে এক ঐতিহাসিক ভাষণ। শিহাব সরকার (১৯৫২) রচিত *জ্যোতির্ময় তর্জনী* কবিতায় দেখা যায় পাখি, তরুবিথী, আসমান, সমুদ্র, মানুষ আর শেখ মুজিবুর রহমান যেন মায়ায় জড়ানো। সমুদ্রের গভীরের অগ্নিগিরি আর স্বপ্নের খনি থেকে উঠে এসেছিল 'জয়বাংলা' ধ্বনি। ৭ই মার্চ তর্জনী উঠিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের স্মৃতি চলে আসে।

যা কিছু আমাদের ছোট বড় অর্জন–
গোপন চাবি ছিল ঐ মহামানবের স্মরে
দেখেনি ওরা তার জ্যোতির্ময় তর্জনী?[১১]

শিহাব সরকার (১৯৫২-) রচিত *নজরুলকে মনে পড়ে* কবিতায় বর্ণিত হয়েছে নজরুল ঢাকা কলেজের ভিপি এবং অস্থির টগবগে অগ্নি শিখা স্বভাব। সেই নজরুলের স্মৃতি কবির কবিতায়–

আমার খুব মনে পড়ে একদিন রিকশায়
যেতে যেতে আমাকে দেখে কী অদ্ভুত গলায়
দু'হাত তুলে চিৎকার করে উঠেছিল,
জয় বাংলা জয় বাংলা
আখাউড়ার কাছে একাত্তরে যখন মেশিনগানে
ঝাঁঝরা হয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল
নজরুল কি শেষবার বলতে পেরেছিল
জয় বাংলা ?[১২]

চির তরুণ, বর্ণিল, বোহেমিয়ান কবি ত্রিদিব দস্তিদার (১৯৫২-২০০৪)। সত্তর দশকের উত্তাল কালপর্বে এই রক্তিম তরুণ নিজেকে সমর্পিত করেন মাটি, মানুষ ও কবিতার অগ্নিমন্ত্রে। ১৯৭১ এ মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং ১৯৭২ এ তাঁর কবিতার প্রথম প্রকাশ। এই কাল পারম্পর্যই তাঁর সার্বভৌম জীবন ও শিল্পসত্তার অনিবার্য নিয়ামক। তাঁর লেখা যুদ্ধক্ষেত্র একটি কবিতায় বর্ণিত হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর বাংকার থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি কবিতা যা রক্তাক্ত দেহে জয় বাংলা বলেছিল এবং শত্রুদের তাড়িয়ে যাচ্ছিল। কবির ভাষায়––

রক্তাক্ত কবিতাটি জয় বাংলা জয় বাংলা বলে
একটি তীক্ষ্ণ স্বরের মধ্য দিয়ে অনবরত শত্রুদের
তাড়িয়ে যাচ্ছিল
তার মুখ থেকে নির্গত হচ্ছিল গর্জমান সামুদ্রিক ফেনাপুঞ্জ
চোখ থেকে রক্তবর্ষণের মতো এক ভয়াবহ তাণ্ডব
রক্তাক্ত দেহে কবিতাটি তখনো বলে চলেছে
জয় বাংলা জয় বাংলা জয় বাংলা।[১৩]

ইকবাল হাসান (১৯৫২-) রচনা করেছেন *আমাদের ক্ষমা করো পিতা*। সত্তর দশকের জনপ্রিয় কবিদের অন্যতম। এই কবিতায় বর্ণনা করা হয়েছে বাঙালি তাঁর জন্মদাতা পিতাকে ভুলে গিয়েছে, ভুলে গেছে বাংলার ইতিহাস। মিথ্যাচার বিকার বিকৃতি নিয়ে আনন্দে মেতে আছে বাঙালি। তাই যাত্রা সম্মুখে না হয়ে পশ্চাতে ধাবিত হচ্ছে।

ত্রিদিব দস্তিদার (১৯৫২-২০০৪) রচিত কবিতা *তুমি পিতৃবীজ* কবিতাটিতে উল্লিখিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর কথা। বঙ্গবন্ধু বাংলার প্রকৃতি, মানচিত্র এবং পতাকার সাথে একাকার হয়েছে এবং বাঙালির আত্মায় রূপান্তর হয়েছে। যেমন:

এভাবে আবর্তিত বাংলার নীড়ে
আছ তুমি বঙ্গবন্ধু প্রকৃতির ভিড়ে
কী করে আলাদা করি এ জাতির প্রাণ
তুমি যে এক আত্মা বাঙালির মান ।[১৪]

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের কবিতায় যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন কবি বিমল গুহ (১৯৫২-২০২১) তাদের অন্যতম । বিমল গুহ একাত্তরের কবিতায় কবিতাকে মন্ত্রবাণে ঘাসের কার্পেটে শুইয়ে শত্রুর বুকে মরণ বুলেট ছুড়ে দিয়ে তাকে জব্দ করার কথা বলেছেন।

কবিতারা মুজিবের বজ্রকণ্ঠে পেয়েছে স্বাধীনতার মন্ত্র,
মুক্তিযোদ্ধার হাতে রাইফেল ট্রিগারের বাটে টোকা
হয়ে ফোটে, ঘাসের আড়ালে 'মাইন' হয়ে ফেটে যেতে
কবিতা যেন শত্রুর বুকে কাঁটা হয়ে বিঁধে কবিতারা
যেন স্বাধীনতার যুদ্ধে নেমেছে।
কবিতারা সেই ৭ই মার্চ শেখ মুজিবের বজ্রকণ্ঠে
মন্ত্র পেয়েছে স্বাধীনতার।[১৫]

কামাল চৌধুরী (১৯৫৭-) *সেই মুখখানি কবিতার বড় ছিল* কবিতায় বঙ্গবন্ধুর কথা বলেছেন, যা স্বাধীনতার প্রিয় ছিল। কান্না ও বিষাদের মধ্যে মুখখানি ছিল মহীরূহের মতো। স্লোগান মিছিলে শব্দিত হয়ে থাকতেন আমাদের পিতা শেখ মুজিবুর রহমান, রণাঙ্গনে ছায়ার মতো থাকতেন। অথচ প্রিয় পিতা রক্ত বুলেটে একাকার হয়ে ছিল ধূপধূনাহীন বারুদের প্রিয় ঘ্রাণে। যে মুখখানি কবিতার বড় ছিল, কবি তাকে আঁকতে চান কিন্তু আঁকতে পারেন না। তাই ব্যর্থতা নিয়ে জেগে থাকেন সারারাত। কবির ভাষায়–

মৃত্যুর রাতে তরতাজা সেই মুখ
রক্তে বুলেটে একাকার শুয়ে ছিল
ধূপধূনাহীন বারুদের প্রিয় ঘ্রাণে
সেই মৃতদেহ যুদ্ধে প্রেরণা ছিল।[১৬]

প্রতিরোধচেতনা

হাসান হাফিজুর রহমানের (১৯৩২-১৯৮৩) *গেরিলা* কবিতায় বাংলার সূর্যসেনের মতো সবাই সৈনিক এবং স্পার্টাকাসের মতো সবাই গেরিলা। যেমন:

বাংলার আপদে আজ লক্ষ কোটি বীর সেনা
ঘরে ও বাইরে হাঁকে রণধ্বনি, একটি শপথে

আজ হয়ে যায় শৌর্য ও বীরগাথার মহান
সৈনিক। যেন সূর্যসেন, যেন স্পার্টাকাস স্বয়ং সবাই।[১৭]

আবার *'শত্রুর লাশ চাই'* কবিতায় প্রতিরোধ এবং বজ্র শপথের সংকল্প দেখা যায়। যেমন:

নিহত ভায়ের লাশ কাঁধে বয়ে ঢের
গড়েছি মিনার, হেঁটে গেছি পথ।
আর নয়, চাই শত্রুর লাশ চাই
-এইবার এই বজ্র শপথ।[১৮]

যখন উদ্যত সঙ্গীন কাব্য সম্বন্ধে রফিকউল্লাহ খানের মন্তব্য––

> কখনো মুক্তিযোদ্ধার আত্মবিশ্বাসদৃপ্ত কুশলী পদচারণায় নিহত ভায়ের লাশ কাঁধে বয়ে (শত্রুর লাশ চাই') প্রতিরোধ প্রতিশোধের বজ্র শপথে কখনোবা, আবার কখনো কখনো কবি জেগে উঠেন কান্নাহীন শেষ আঘাতের অমোঘতায় (আমরা পারি না কাঁদতে)। এভাবেই কবির জীবনাবেগ ও তত্ত্বাবেগের সমন্বিত শিল্পরূপ হয়ে ওঠে যখন উদ্যত সঙ্গীন কাব্য। শেষ কবিতার জিজ্ঞাসা কাতরতা (আমার আনুগত্য) তার জীবনবোধের ন্যায় সূত্রের যথার্থ। কেননা যুদ্ধোত্তরকালের সমাজবাস্তবতা সংবেদনশীল শিল্পীর জন্য ছিল এক জটিল জিজ্ঞাসার অন্তহীন গহ্বর। স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের মধ্যবিন্দুতে হাসানের এই যন্ত্রণা জাতীয় জীবনের বস্তুগত সত্যের মর্মমূল স্পর্শ করেছে।[১৯]

আবু হেনা মোস্তফা কামাল (১৯৩৬-১৯৮৯) রচিত *নিরস্ত্র বিরোধ* এবং *ছবি* মুক্তিযুদ্ধের কবিতা। *নিরস্ত্র বিরোধ* কবিতায় রক্তপাত, বিষাক্ত বুলেট প্রেমিকার সেন্ডেলের দাগ প্রভৃতি প্রসঙ্গ এসেছে। ছবি কবিতায় বাংলাদেশ নামক ছবির মতো দেশটির উপাদান নরমুণ্ড উপমার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন:

খাঁটি আর্যবংশসম্ভূত শিল্পীর কঠোর তত্ত্বাবধানে ত্রিশ লক্ষ কারিগর
দীর্ঘ নটি মাস দিনরাত পরিশ্রম করে বানিয়েছেন এই ছবি
এখনো অনেক জায়গায় রং কাঁচা- কিন্তু কী আশ্চর্য গাঢ় দেখেছেন?
... ...
আর দেখুন, এই যে নরমুণ্ডের ক্রমাগত ব্যবহার––ওর ভেতরেও
একটা গভীর সাজেশান আছে––আসলে ওটাই এই ছবির অর্থাৎ
এই ছবির মতো দেশের থিম।[২০]

আবিদ আনোয়ারের (১৯৫০-) *দ্রব্যগুণ* কবিতাটি জেনারেল টিক্কা খানের উদ্দেশ্যে লিখিত। জেনারেল টিক্কা খান সম্বন্ধে মতামত––

> ১৯৭০ সালে নিষ্ঠুরতার সাথে সাথে বালুচিস্তানে বিদ্রোহ দমনের নামে হত্যাকাণ্ড চালানোর জন্য বালুচিস্তানের কসাই হিসেবে টিক্কা খান কুখ্যাতি অর্জন করেন। টিক্কা খান ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সামরিক শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন কালে বালুচিস্তানের নিরস্ত্র নিরীহ বাঙালিদের ওপরও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুর সামরিক হামলা পরিচালনা করেন সেজন্য তাকে বাংলার কসাই বলা হয়।[২১]

কবি জেনারেল টিক্কা খানের উদ্দেশ্যে বলেন একা তুমি শক্তিধর নও বরং অনুগত প্রজার মাঝে থাকে বীরের মত শক্তি এবং হৃদয়ে গ্রেনেড। যেমন:

অনুগত প্রজার বিনিময়ে কিছু কিছু বিচ্যুতি থাকে-

তারও চেয়ে সফল নিয়মে
বিনীত কুর্নিশ করে হেঁটে যায় সমুদ্রের ঢেউ
(ওটা কোনো দুর্বলতা নয়)
সহজ সরল জল তরলতা ভুলে গেলে
কখনো কখনো খাঁটি সম্রাটের মতো
সাথে নিয়ে ব্যক্তিগত ধবল বাহিনী
দাপটে কাঁপিয়ে তোলে সমুদ্রের শান্ত বেলাভূমি
... ...
হে আমার মাতৃভূমি তোমার উদিত জন্মদিনে
উপহার দেব বলেই
আমি মুঠোর মধ্যে রেখেছিলাম।
তরুণ স্পন্দন ভরা আমার হৃদয়ের মতো এই স্নিগ্ধ গ্রেনেড।[২২]

সৈয়দ হায়দার (১৯৫০-২০০৯) রচিত *কেন মুক্তিযুদ্ধ* কবিতায় বর্ণিত হয়েছে, রক্তাক্ত করছে বাঙালিকে কিন্তু পাকিস্তানিদেরকে পরাজিত করার জন্য এবং সূর্যটিকা পরানোর জন্য বাংলার বুকে জড়িয়ে রয়েছে মুক্তিযোদ্ধা। যেমন:

কজনকে হত্যা করবে হে পাকিস্তানি সি-ইন-সি
মৃত্যু যদি সমাধান হত কে পরাবে সূর্যটিকা
অনন্ত সময় ধরে আগন্তুকের কপালে
ওর নাম মুক্তিযোদ্ধা দেশকে বুকে জড়িয়ে আছে।[২৩]

ত্রিদিব দস্তিদার (১৯৫২-২০০৪) *বোবা মেয়েটি* কবিতায় বোবা মেয়ের গোলাপের সুগন্ধ শ্রবণ, বৃক্ষের মায়াবি ফলন, পাখির অস্থির ডানার কম্পন, পাথরের গায়ে শিশিরের ঝড়ো কান্না প্রভৃতি দৃশ্যের সাথে নিস্তব্ধতার মধ্যে একজন মুক্তিযোদ্ধার ছায়া, হাসির মধ্যে যেন এক অনিবার্য অগ্নি উৎপাত, অপরাজেয় বাংলা যেন নির্বাক প্রতিবাদ, একাত্তরের শোকাহত জননী যেন বাকহীনতায় বিক্ষুব্ধ এক উজ্জ্বল গণতন্ত্রের দিন প্রভৃতি বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন:

তুমি শোকাহত জননীর একাত্তর বাংলাদেশ
তুমি বাকহীনতায় এক উজ্জ্বল গণতন্ত্রের দিন।[২৪]

কবি নির্মলেন্দু গুণ (১৯৪৫-) তাঁর হৃদয়ের মতো মারাত্মক একটি আগ্নেয়াস্ত্রের সাথে স্বাধীনতাকে তুলনা করে উচ্চারণ করেন:

পুলিশ স্টেশনে ভিড়, আগ্নেয়াস্ত্র জমা নিচ্ছে শহরের
সন্দিগ্ধ সৈনিক
আমি শুধু সামরিক আদেশ অমান্য করে হয়ে গেছি
কোমল বিদ্রোহী, প্রকাশ্যে ফিরছি ঘরে,
অথচ আমার সঙ্গে হৃদয়ের মতো মারাত্মক
একটি আগ্নেয়াস্ত্র- আমি জমা দিইনি ।[২৫]

মুহম্মদ নূরুল হুদা (১৯৪৯-) রচিত *একবার পরাজিত হলে* কবিতায় বুলেট প্রবিষ্ট এক গেরিলার মুখ এবং পৃষ্ঠদেশে তাঁর সঙ্গিনের বাঁকা ক্ষত দেখে পাকিস্তানিদের 'নীল কারাগার' ভেঙে ফেলতে

চান। এখানে 'নীল কারাগার' প্রতীকটি পাকিস্তানিদের শাসন, শোষণ, অত্যাচারে জর্জরিত পূর্ব পাকিস্তানকে কারাগারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেমন:

যেন আমি জেনে গেছি পরিধি আমার
আমি সুনিশ্চিত ভেঙে ফেলব
উদ্বাহু নীল কারাগার।[২৬]

মোহন রায়হান (১৯৫৬-) রচিত *তোমার জন্য মাগো* কবিতায় বর্ণিত হয়েছে কবির রক্ত কেউ যদি কোটি ডলারের বিনিময়ে কিনে নিতে চায়, তবে দেবে না সেই হায়েনাকে। বরং বাংলা মায়ের পদ্মা, মেঘনা, যমুনায় রক্ত ঢেলে দেবে সম অধিকারের জন্য। রক্তদান করবে যেন শিউলি, বকুল ফুল সুখে খোঁপায় গুজতে পারে জন্মভূমি বাংলা।

পাকিস্তান-প্রসঙ্গ

বাঙালি সংস্কৃতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার আইয়ুবি ধারার কৌশলী চেতনা, শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর এই দেশ সামরিক শক্তির মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়। এই সব কবিদের মাঝে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে অনেক কবিই এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে লিখেছেন কবিতা। ত্রিদিব দস্তিদার এর *ব্লাকবোর্ড* কবিতাটি এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন:

গালে হাত দিয়ে বসে থাকা বর্ণ -শিশুরা
শুধু শুনতে চায়
আমাদের বীরগাঁথা, মুজিবনগর কাহিনী
কে যেন অদৃশ্য ডাস্টার হাতে
আমাদের সব বীরগাঁথা মুছে দিয়ে যায়?
আগামীর শিশুরা শুধু বসে থাকে
চিবুকে দুহাতে রেখে
চোখের সামনে নিয়ে এক বিবর্ণ ব্লাকবোর্ড।[২৭]

মোহন রায়হান (১৯৫৬-) *সবুজ চাদরে ঢাকা রক্তাক্ত ছুরি* কবিতায় ঘাতকদের প্রসঙ্গ টেনেছেন। গোখুর যেমন সবুজ ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, ঠিক তেমনি ৭১ এর ঘাতকরা সবুজ চাদরে ঢেকে রেখেছে রক্তাক্ত ছুরি। আবার এই ঘাতকেরা সুযোগ বুঝে রক্তাক্ত করতে পারে সাবুজিক জন্মভূমি। যেমন:

সবুজ চাদরে ঢেকে রেখেছে রক্তাক্ত ছুরি
কেউ দেখতে পাচ্ছে না যেরকম সন্তর্পণে
গোখুর লুকিয়ে থাকে সবুজ ঝোপের মধ্যে।
... ...
ঝোপ বুঝে কোপ দেবে আমূল বসাবে বুকে
ঠিক ঠিক একদিন ঘাতকের তীক্ষ্ণ ছুরি
আবার রক্তাক্ত হবে সাবুজিক জন্মভূমি।[২৮]

রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৯৫৬-১৯৯১) প্রতিবাদী কবি হিসাবে খ্যাত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, দেশাত্মবোধ, গণ-আন্দোলন, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতা তাঁর কবিতায় বলিষ্ঠভাবে উপস্থিত। স্বাধীনতাকে নিয়ে কবিরা অপেক্ষা করেছেন আবার মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার

জন্য কবিতায় আহ্বান জানিয়েছেন অনেক কবি। *বাতাসে লাশের গন্ধ* কবিতাটি ৩-১২-১৯৭৭ সালে সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকায় রচনা করেন। *বাতাসে লাশের গন্ধ* কবিতায় কবি স্মৃতিতে নিয়ে এসেছেন মুক্তিযুদ্ধের কথা, মানুষ কি ভুলে গেছে সেই দুঃস্বপ্নের রাতের কথা, সেই রক্তাক্ত সময়ের কথা। কবি মনে করেন জাতির পতাকা আজ খামচে ধরেছে সেই পুরোনো শকুন। কবি তন্দ্রার ভেতরে শুনতে পান ধর্ষিতার করুণ চিৎকার। দেখতে পান নদীতে পানার মতো ভেসে থাকা মানুষের পঁচা লাশ, মুণ্ডুহীন বালিকার কুকুরে খাওয়া বীভৎস শরীর যা কবিকে ঘুমাতে দেয় না। কাফনে মোড়া লাশ, কুকুরে খাওয়া, শকুনে খাওয়া লাশ যথাক্রমে কবির আত্মার বন্ধন ভাই, মা ও পিতা। অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা এবং স্বজন। তাই কবির মতে, ধর্ষিতা বোনের শাড়ি যেন রক্তাক্ত জাতির পতাকা। যেমন:

রক্তের কাফনে মোড়া কুকুরে খেয়েছে যারে, শকুনে খেয়েছে যারে
সে আমার ভাই, সে আমার মা, সে আমার প্রিয়তম পিতা।
স্বাধীনতা- সে আমার স্বজন হারিয়ে পাওয়া একমাত্র স্বজন,
স্বাধীনতা- সে আমার প্রিয় মানুষের রক্তে কেনা অমূল্য ফসল
ধর্ষিতা বোনের শাড়ি ওই আমার রক্তাক্ত জাতির পতাকা।[২৯]

স্বপ্নভঙ্গ ও হতাশা

মুহম্মদ নূরুল হুদা (১৯৪৯-) রচিত *বিজয়*, *মানবপদ্ম*, ও *দুধখোকা* প্রতীকধর্মী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কবিতা। *বিজয়* কবিতাটিতে একজন বাবুর কথা বলা হচ্ছে যার বয়স পঁচিশ বছর। এখনো ভালো করে হাঁটতে শিখেনি যেন আলাভোলা, পা-ঝোলা। বিজয়ের ঘরে কারা যেন গভীর রাতে আসা-যাওয়া ফিসফাস করে এবং বিজয়ের চালচলনে যেন অসূয়া বা পরশ্রীকাতরতা ভর করেছে। বিজয় আকাশের স্বাধীনতা দেখছে, বাঙালি বিজয়ের মধ্যে আর এক আকাশ দেখে। এখানে 'বিজয়' মূলত বাংলাদেশের প্রতীক। *দুধখোকা* কবিতায় দুধখোকা বলতে বাংলাদেশকে বুঝানো হয়েছে। দুধখোকা নামক সন্তান বড় হলেও মায়ের কাছে ছোট দুধখোকা যার বয়স বাড়ে না। উৎকণ্ঠিত মা সবসময় সন্তানের কথায় ভাবে।

মাহবুব হাসানের (১৯৫৪-) *বিজয় আমার স্বাধীনতা* কবিতায় মুক্তিযুদ্ধকালীন স্মৃতি এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। বিজয় ভালোবাসে স্বাধীনতা, স্বাধীনতা ওর হৃদয় কমলে, আন্দোলিত শস্যক্ষেত্রে সৌরভ শিশিরে বিজয়ের গান দেখা যায়। দীনহীন কিশোরীর চোখে সাহস। এক সময় মহানন্দপুর, শালবন, তার অলিগলি আর ভাঙা স্কুলের ফোকর দিয়ে কবিকে বিজয় চিনিয়েছে স্বাধীনতা, পায়ে গ্রেনেড খাওয়া খোকার চোখে ছিল স্বাধীনতা, কবি হৃদয়ে ছিল বিজয়ের গান। কিন্তু এখন বিজয়কে দীন দরিদ্রের মতো মনে হলে ব্যর্থ মনে হয়, কিছুই পেটে না পড়া ক্ষুধার্তের মতো বিজয়ের অবস্থা। কবির দ্বিধা যুদ্ধকালীন সেই মহানন্দপুর নেই, ওর চোখের তারায় সেই আলো নেই যা বিজয়ের চোখে দেখা গিয়েছিল। যেমন:

মহানন্দপুর শালবন, তার অলিগলি আর
ভাঙা স্কুলের ফোকর দিয়ে
বিজয় আমাকে চিনিয়েছে স্বাধীনতা
পায়ে গ্রেনেড খাওয়া খোকার চোখে ছিল স্বাধীনতা
আমি সেই আলো পেয়েছিলাম
আমার হৃদয় ছিল বিজয়ের গান

কিন্তু আজ?
এ আমি কাকে নিয়ে হাঁটছি?
এই কি বিজয়?[৩০]

মিনার মনসুরের (১৯৫৯-) *প্রিয় বাংলাদেশ* কবিতায় বর্ণনা করা হয়েছে একদিন বাঙালির শোণিতে ছিল দুরন্ত নাচন, সাহসের সুতীব্র উত্থান, টগবগে রেসকোর্স মানুষের উন্মাতাল ঢেউ, এখন এসবের আর কিছু অবশিষ্ট নেই, সমগ্র চেতনা জুড়ে শুয়ে আছে অনন্ত শ্মশান। কবির ভাষায়–

মানুষের হাড়ে-মাংসে লেগেছে পচন
মননেও ঢুকে গেছে সর্বনেশে হিমেল হাওয়া।[৩১]

মিনার মনসুরের *কী জবাব দেব* কবিতায় বর্ণনা করা হয়েছে ১৯৫২ সালের সালাম বরকতেরা যদি রক্তমাখা চিঠির মাধ্যমে জানতে চায় তাঁদের স্বর্ণোজ্জ্বল বর্ণমালা সম্বন্ধে, ১৯৬৬ সালের মনু মিয়া যদি জানতে চায় লাল সাম্যের পতাকা সম্বন্ধে, ১৯৭১ সালের সিংহের মতো গর্জন করা যোদ্ধারা যদি জানতে চায় পবিত্র সংবিধান প্রেম ও বিশ্বাসগুলো কোথায় রেখেছি, যদি ১৯৭৫ সালের উজ্জ্বল মানুষেরা, সেইসব সাহসেরা, নারী শিশু যুবকেরা যদি দেয়ালের সুদৃশ্য ঝুলন্তফ্রেম থেকে গভীর নিশীথে চুপচাপ নেমে আসে দরজায় কড়া নাড়ে, বেতারে নীরবতা ভেঙে গর্জে উঠে জানতে চায় স্বপ্নময় চিরদুঃখী মানুষ সম্বন্ধে, উজ্জ্বল স্বপ্ন সম্বন্ধে তাহলে অক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই নাই। অথচ বাঙালি পড়ে আছে আত্মঘাতি যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা নিয়ে। *'প্রিয় স্বাধীনতা'* কবিতায় বড় উদভ্রান্তের মতো লোকের জটলায়, রিকশার টুংটাং শব্দে, বাসের কর্কশ চিৎকারে, মাইকের শব্দে, উৎসবের মহড়ায়, সুসজ্জিত মঞ্চে, জমকালো পার্টিতে, পোস্টার প্রতিকৃতিতে, বেতার-টেলিভিশনে, পৌরসভা নিউ মার্কেটে, সংরক্ষিত পুলিশ ভবন জেলে কবি মনসুর স্বাধীনতা শব্দটি খোঁজার চেষ্টা করেন, প্রিয় স্বাধীনতাকে দেখতে পাননি বরং পেয়েছেন নিষিদ্ধ নির্বাসিত হিসেবে আত্মার স্বজন প্রিয় স্বাধীনতাকে।

রবীন্দ্র গোপ লিখেছেন *মুক্তিযুদ্ধ* কবিতাটি, বর্ণনায় পাওয়া যায় নতুন প্রজন্ম যেন মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে মনে রাখে তার বিজয়ের সময়কে। সবুজ শাড়ি ও সিঁদুর টিপ পরে রক্তিম সূর্যকে জাগালে যৌবন আসবে, ভালোবাসা আর রক্ত দানের মাধ্যমে আসবে স্বাধীনতা। মুক্তিযুদ্ধের রক্তের ইতিহাস বাদ দিলে, নতুন প্রজন্মের কোন জন্ম ইতিহাস থাকবে না, থাকবে না জাতির ঐতিহাসিক যৌবন শক্তি। যেমন:

তোমার জন্মের সাথেই আমার রক্ত মিশে আছে
আমার রক্তটুকু বাদ দিলে
আমার যৌবন বিয়োগ হবে
তা হলে মুক্তিযুদ্ধ থাকবে না তোমার জন্ম ইতিহাস হবে না [৩২]

শিহাব সরকার (১৯৫২-) রচিত কবিতা *তিন কবরে* বর্ণিত হয়েছে তিন যুবার মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার এবং তাদের কবরে শায়িত হওয়ার বিষয়টি। উল্লিখিত হয়েছে অগ্নিকন্যা লাশের স্তনে মুখ গুঁজে শিশুরা কাঁদছিল, খরার জমি উর্বর হয়েছিল টগবগে রক্তে। নবীন প্রজন্মের সামনে আজ অন্তহীন

নবান্ন উৎসবে তুমুল মাদলের শব্দে ভুলে গেছে সেই মুক্তিযুদ্ধের দৃশ্য। তাই কবি শতায়ু ছানিপড়া বৃদ্ধের স্মৃতিতে জানতে চান—

ছানিপড়া বৃদ্ধেরা জানে সব
বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে মরে যাবার আগে
ওরা দিয়েছিল ঠোঁটে অন্তিম পানি
বৃদ্ধেরা আজ তা বলবে না, ওরা নিঝুম বসে আছে
বালকেরা কলরোল করে স্কুলে যায়
বিজয়োৎসবের কুচকাওয়াজে চলেছে নবীন পুরুষেরা
জানে না কারা শুয়ে আছে তিন কবরে।[৩৩]

শহীদ কাদরী (১৯৪২-২০১৬) *তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা* কাব্যগ্রন্থে *রাষ্ট্র মানেই লেফট রাইট লেফট* কবিতায় রাষ্ট্র বলতে অনেক ব্যর্থতার বিষয় চিহ্নিত করেছেন তার কবিতায় যা বর্ণিত হয়েছে মিছিল থেকে না ফেরা কনিষ্ঠ সহোদর, হাসপাতালে আহত মজুরের মুখ, কলেজের মোড়ে দুইজন নিহত, পাঁচজন আহত। রাষ্ট্র মানেই ব্যর্থ সেমিনার, পররাষ্ট্র নীতি সংক্রান্ত ব্যর্থ সেমিনার। কবির ভাষায়:

রাষ্ট্র বললেই মনে হয় মিছিল থেকে না - ফেরা
কনিষ্ঠ সহোদরের মুখ
রাষ্ট্র বললেই মনে হয় তেজগাঁ
ইনডাস্ট্রিয়াল এলাকা
হাসপাতালে আহত মজুরের মুখ।[৩৪]

না প্রেমিক না বিপ্লবী কাব্যগ্রন্থের *স্বাধীনতা*, *উলঙ্গ কিশোর* কবিতায় সদ্য স্বাধীনতা পাওয়া দেশকে কিশোরের সাথে তুলনা করেছেন কবি নির্মলেন্দু গুণ। দুঃখ, ক্ষুধা, ঘৃণা কোনো স্বাধীনতা নয় এর উত্তরণ ঘটিয়ে কবি স্বাধীনতাকে দীর্ঘজীবী কামনা করেছেন। যেমন:

বলো উলঙ্গতা স্বাধীনতা নয়
বলো দুঃখ কোনো স্বাধীনতা নয়
বলো ক্ষুধা কোনো স্বাধীনতা নয়
বলো ঘৃণা কোনো স্বাধীনতা নয়
জননীর নাভিমূল ছিন্ন-করা রক্তজ কিশোর তুমি,
স্বাধীনতা, তুমি দীর্ঘজীবী হও।
তুমি বেঁচে থাকো আমার অস্তিত্বে, স্বপ্নে,
প্রেমে, বল-পেন্সিলের যথেচ্ছ অক্ষরে
শব্দে,
যৌবনে;
কবিতায়।[৩৫]

আবিদ আজাদ (১৯৫২-২০০৫) রচিত *এখন যে কবিতাটি লিখব আমি* কবিতায় একটি কবিতা লেখার কথা বলেছেন যা লিখার ফলে নেমে আসবে মৃত্যু এবং বাংলাদেশের সবুজ রং কালো হতে হতে ভয়াল গর্জনে সমুদ্রের মতো ফেটে পড়বে। কবিতাটি লেখার ফলে চেকপোস্ট বসবে, শুরু হবে খানাতল্লাশী বেশ্যাপাড়ার দাগী-খুনির লুঙ্গির গাঁট থেকে শুরু করে অধ্যাপকের উড়োচুল পর্যন্ত তল্লাশী করা হবে। একটি কবিতা লেখার কারণে ধরা পড়তে পারে সীমান্ত

পুলিশের হাতে লক্ষ টাকার গুঁইসাপের চামড়া, সীমান্তরক্ষীর হাতে ধরা পড়বে চোরাচালানিসহ কয়েকলক্ষ টাকা, বিদেশি শাড়ি, ইউনিভার্সিটির হলগুলি তছনছ করে টিভি রুমের ভিতর থেকে সন্দেহবশত ধরে নিয়ে যাবে দুজন ছাত্রকে। কবিতাটি যখন পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা পড়বে তখন ব্যর্থ কাঁধের পাশে দাঁড়িয়ে অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ ফেলবে দীর্ঘশ্বাস। কবিতাটি পড়ার ফলে প্রৌঢ় স্কুল মাস্টারের শূন্য চোখে ভেসে উঠবে শিমুল গাছের নিচে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ছেলের লাশ। কবিতাটি লেখার ফলে পত্রিকাগুলোতে শুরু হবে গুঞ্জন, চাকরি যাবে তথ্য সচিবের এবং ইস্তফা দিতে হবে তথ্যমন্ত্রীকে। কবিতাটি লেখার ফলে দুটো ঠাণ্ডা লোহার হাতকড়া পড়তে হতে পারে, এবং ঘাতক ছুরির আঘাত। অথচ বাংলাদেশ নামক দেশটি প্রিয়তমা নারীর সন্তান জন্মের যন্ত্রণা মুখে নিয়ে অপেক্ষা করছে এই কবিতাটির জন্য এমন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কবিতাটিতে।

এখন যে কবিতাটি লিখব আমি
তার জন্য আমার সন্তানের জন্মের যন্ত্রণা মুখে নিয়ে
আমার প্রিয়তমা নারীর মতো
অপেক্ষা করছে আমার বাংলাদেশ।[৩৬]

নাসির আহমেদ (১৯৫২-২০২১) *বুকের ভেতরে বাজে* কবিতায় বর্ণিত হয়েছে প্রায়শ গভীর ঘুম ভেঙে যায় তীব্র স্লোগানের শব্দে এ যেন রক্তাক্ত ঊনসত্তর সালের গনগনে রাজপথ অথচ তখন ১৯৬৯ সাল নয়। সুখ শান্তি যেন নির্বাসনে। অথচ শান্তির জন্য স্বস্তির জন্য শ্যামল স্বদেশে বৃষ্টির মতো রক্ত ঝরিয়েছে, দেয়ালের বুলেটের ক্ষতচিহ্ন মুছে গেছে, নিহত ফজলুর কবরে শিউলি ফুলের থোকা ফুটল, বিধ্বস্ত ট্যাংকের চারদিকে বুনো ঝোপ এবং নানা রঙের ঘাসফুল ফুটেছে, এসেছে প্রজাপতি অথচ কবিহৃদয়ে স্বস্তি কিংবা চোখে সুনিদ্রা আসছে না কারণ দেশে এখনো যুবকেরা মারমুখো, শ্রমিকেরা উত্তেজিত। আবার 'বিজয়ের বোন কড়া নেড়ে যায়' কবিতায় বিজয়কে ভাই এর প্রতীকে যা স্বাধীনতার সাথে তুলনা করা হয়েছে। কবিতাটিতে বর্ণিত হয়েছে বিজয় মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছে, ২৫ মার্চ ১৯৭১ বিজয়ের বাবা-মা শহিদ আর বিজয়ের বোন ধর্ষিত। বিজয় মুক্তিযুদ্ধে সংগ্রামরত। অথচ ধর্ষিতা বোন বিজয়কে ডাকছে, বিজয় কোথায়? এভাবে ২৭ বছর কেটে গেল অথচ বোন বিজয়কে খুঁজছে। এখানে মূলত স্বাধীনতার ২৭ বছর পেরিয়ে গেলেও নারী অত্যাচারিত, দেশে এখনো চামচিকা আর বাদুড়েরা ঝাঁক বেঁধে উড়ছে তা উল্লিখিত হয়েছে।

বাবা-মা শহীদ পঁচিশের রাতে বিজয় গিয়েছে বিজয়ের পথে
গহীন গেরিলা শত্রু হননে সশস্ত্র সংগ্রামে।
ধর্ষিতা বোন ফিরেছে যখন তখনো রুদ্ধ ঘরের দুয়ার
গলার রক্ত তুলে ডেকে যায় বিজয় কোথায় ! বিজয়! বিজয়![৩৭]

কামাল চৌধুরী (১৯৫৭-২০২২) ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ সালে *ক্রাচের যুবক* কবিতাটি রচনা করেন। *ক্রাচের যুবক* কবিতায় একজন যুবকের কথা বলা হচ্ছে যে একদিন ছিল যুদ্ধবাজ, ধর্ষিতা বোনের শাড়ি অকস্মাৎ রাইফেল হয়ে যায়। ইতিহাস কেঁপে ওঠে রক্তে রক্তে। বীর্যবান সুদৃঢ় বাহুতে জেগে আছে বাংলাদেশ সাত কোটি মানুষের প্রেম অথচ আজ পঙ্গুত্বের জন্য তিনি অসহায়। কবি বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে বলেন—

বাংলাদেশ

তাকে তুমি খোলা চোখে দেখ-ভালবাস
ভুল করে কোনোদিন করুণা কোরো না।[৩৮]

সংগ্রামের স্মৃতি

সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৮-১৯৭৫) রচিত *বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে ইতিহাস* কবিতায় কবি যুদ্ধকালীন চিত্র অংকন করেছেন। জননী বাঙলা যেন জ্বেলেছে নিজের দেহে সুবিশাল ধর্ষণের চিতা। অথচ চিত্রকল্পের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন বাংলার পূর্ব চিত্র। চড়ুইয়ের অনর্গল দুর্বোধ্য কলহ, বাবুইয়ের ইমারতে ঝড়ের নিশ্চয় দাপাদাপি, টুনটুনি শালিকের শ্রীহীন কুটিরে মুখরিত শান্তিনিকেতন, মেঘনার কালোজল গাঙচিল মেঘ, রজনীগন্ধার ঘ্রাণে উল্লিখিত জোনাকি নর্তকী প্রভৃতি চিত্র অংকিত হয়েছে। সিকান্দার আবু জাফর রচিত *বাংলা ছাড়ো* কবিতা যুদ্ধকালীন দলিল। *বাংলা ছাড়ো* ৭ মার্চ, ১৯৭১ *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দুধ ও কলা দিয়ে সাপ পুষলে, তা সময় মত ছোবল মারে। তাঁর কবিতায় *কেউটে সাপের ঝাঁপি* প্রতীকটি হানাদার বা পাকিস্তানি শক্তির কার্যক্রমকে বুঝানো হয়েছে। কবির ভাষায়–

আজকে যখন হাতের মুঠোয়
কণ্ঠনালীর খুনপিয়াসী ছুরি,
কাজ কি তবে আগলে রেখে বুকের কাছে
কেউটে সাপের ঝাঁপি।

... ...

তিক্ত প্রাণ শ্বাপদ নখের জ্বালা
কাজ কি চোখের প্রসন্নতায় লুকিয়ে রেখে প্রেতের অট্টহাসি।[৩৯]

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের (১৯৩৬-২০০৮) *শহীদ স্মরণে* কবিতার বর্ণনায় পাওয়া যায় যখন হানাদার বধ করছে বাঙালিকে তখন পূর্ব পাকিস্তানের তরুণেরা মেশিনগান, মর্টার, গ্রেনেড নিয়ে যুদ্ধ করছে। মনিরামপুরের আসাদের রক্তের বিনিময়ে পেয়েছি রক্তাক্ত পতাকা। আসাদের মৃত্যুতে তাঁর মা ও বাবার দুচোখে শত্রু হননের আহবান। মতিউর তার পরিবার মাহিন, তুহিন, ও মিলিকে ফেলে স্বদেশের হয়ে যুদ্ধ করার জন্য করাচির খাঁচা থেকে মহাশূন্যে টি-৩৩ বিমান নিয়ে আসার চেষ্টা করে। কবির দুর্জয় হাতে নির্ভুল স্টেনগান কথা বলে। এই কবিতা যেন বুকের রক্তে লেখা নাম বাংলাদেশ। কবির ভাষায়–

কবিতায় আর নতুন কি লিখব
যখন বুকের রক্তে
লিখেছি একটি নাম
বাংলাদেশ।[৪০]

মুক্তিযুদ্ধের সময় চারদিকে আর্তচিৎকার বাঁচাও বাঁচাও। বুক ফেটে যায় বিষাক্ত মাইন এবং বুলেটে। বাঙালি বীরের জাতি অগ্নিপরীক্ষা দিবে তবুও মাথা নোয়াবে না। মুক্তিযুদ্ধের চিত্র দেখা যায় মুহম্মদ নূরুল হুদার (১৯৪৯) *বুলেট* কবিতায়। এখানে *বুলেট* মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণার প্রতীক। কবির বর্ণনায়-

একাত্তরে
আমিও বুলেট ছিলাম আমার নিজের

একাত্তরে
আমরা চাষ করেছি বুলেট বীজের।[৪১]

খোন্দকার আশরাফ হোসেন (১৯৫০-২০১৩) রচিত *বাউসী ব্রিজ ৭১* কবিতায় প্রকৃতির মধ্যে চাঁদ, মেঘ, সূর্য, নদী, কাঠবিড়ালি প্রভৃতি রূপকের মাধ্যমে যুদ্ধের স্মৃতি তুলে ধরেছেন। কবি যখন কাঠবিড়ালির মতো নৈপুণ্যে যোদ্ধা সেজে সামনে এগুচ্ছেন তখন *বাউসী ব্রিজ' ৭১* সামনে মায়ের ভালোবাসা ছাড়া কোন রক্ষাবর্ম ছিল না এমনকি পাদুকা পর্যন্ত ছিল না। অন্ধকার ব্রিজের ওপারে যোদ্ধারা দেখতে পায় মা, প্রেমিকা, মাতৃভূমি কিংবা স্বাধীনতা। বাউসী ব্রিজকে ধ্বংস করার পূর্ব মুহূর্তে কোমল আবেগ ডুকরে কেঁদে উঠার দৃশ্য উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন––

মায়ের ভালবাসা ছাড়া বুকের দুইইঞ্চি নিচে দুকপুক আমাদের
হৃদয়গুলোর জন্য ছিল না অন্য কোনো রক্ষাবর্ম, আমাদের পায়ের নিচে
ঘাস ছাড়া অন্য কোনো পাদুকা ছিল না।
... ...
আর আমাদের শিরায় শিরায়
রুদ্ধ ঝরনার ধারা অস্ত্রের ধাতব মুখে পুষ্পিত উল্লাসের মতো
আকাশ ও মাটিতে নামবে আঠার কোরাসের অঝোর বৃষ্টি
ব্রিজের ইস্পাত বুক উদ্দাম আনন্দে ধুলো হবে, নক্ষত্রের শিরায় শিরায়
বেজে উঠবে ফুলকির নূপুর।[৪২]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় কবি ওবায়দুর রহমান এর কথা। যিনি কেবল একাত্তরে বাংলার মুখ সম্পাদনাই করেননি, তিনি যুদ্ধোত্তর বিধ্বস্ত বাংলাদেশে একই শিরোনামে পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন। সে সময় তাঁর কাছে স্টেনগান, রাইফেল ও রিভলভারও ছিল না। যুদ্ধের জন্য একটি কলম, তাজা মন আর সদিচ্ছা ছিল। কবি ওবায়দুর রহমানের একটি কবিতা––

আমি এক লড়াকু সৈনিক,
অথচ আমার কোনো হাতিয়ার নেই
নেই স্টেন, ব্রেন, রাইফেল কিংবা
ছোট রিভলভারও,
একটি কলম, তাজা মন আর সদিচ্ছা
এই সম্বল করে আমি লড়ছি।
আমি এক লড়াকু সৈনিক।

গোলাম কিবরিয়া পিনু (১৯৫৬-) রচিত *মুক্তি* কবিতায় মুক্তিযোদ্ধারা পলের পুঞ্জে শীতকে পরাজিত করে, ভাসানো ভেলায় গেছে উজানে স্রোতের বিপরীতে উলিপুর। জনতার কাছাকাছি থেকে রেখেছিল হাত রাইফেল জনতার জন্যে অরণ্যে ফুটেছে ফুল এবং অর্জন করেছে মুক্তি এমন চিত্র দেখানো হয়েছে কবিতাটিতে। গোলাম কিবরিয়া পিনু রচিত *এই স্বাধীনতা* কবিতায় বর্ণিত হয়েছে অশ্রুসজল চোখের পাতা হতে শোকাবহ জলে, বুকভাসা রক্তে, কষ্টের নিঃশ্বাসে, বারুদের গন্ধে অর্জিত আমাদের এই স্বাধীনতা। হাজার বছরের পরমাণু নিয়ে খনিজ শক্তিতে, একই চেতনায় শস্যমুখী রোদে বিজয় উল্লাসে উন্মুখ আমাদের স্বাধীনতা।

আমিনুর রহমান সুলতান (১৯৬৪-) রচিত *লোনার পতাকা* কবিতায় বর্ণনা করা হয়েছে ছোট মেয়ে লোনা যে এখনো অ, আ পড়ে কিংবা দেখে দেখে ছবি আঁকে। বড়দের কাছে বাংলাদেশ

পতাকার অবয়ব জানতে পেরেছিল। লোনার আঁকা পতাকাটি সম্বন্ধে পাকিস্তানিরা জানতে চেয়েছিল কিসের পতাকা এটি, লোনা বলে- বাংলাদেশের পতাকা। ছোট লোনা শিখেছিল বড়দের কাছ থেকে প্রতিবাদী চেতনা।

বুকের ওপর জাপটে ধরে বলেছিল
বাংলাদেশের পতাকা
লোনা হয়ত বোঝেনি তখনো
লোনার বুকে নয় যেন
স্বাধীন বাংলাদেশের বুকে শোভা পাচ্ছে
লোনার পতাকা।[৪৩]

হুমায়ুন কবির (১৯৪৮-১৯৭২) তাঁর *আমার ভাই* কবিতায় বর্ণনা করেছেন নিজের ভাই স্বাধীনতা পছন্দ করতেন পিতার আবাধ্য হয়ে রক্তিম সাহস নিয়ে স্বদেশ রক্ষায় ঝাঁপ দিল যুদ্ধে সঙ্গীন বিঁধল শত্রুদের দেহ, স্বাধীনতা প্রিয় ছিল কিশোর ভাইয়ের, সেও স্টেনগানে বাজালো সংগীত। বিরোধী বন্দুক থেকে একটি নিপুণগুলি তাকে বিদ্ধ করল, ইস্পাতের সাথে মিশে রক্তের ঘ্রাণে তাকে বুঝিয়েছে জন্মভূমি। যেমন:

বিরোধী গুলির ক্ষতে যখন সুস্থির হয়ে
আকাশের নিচে, চোখে তার বিস্মিত আকাশ
মানবিক শুদ্ধ রীতি, বঙ্গদেশে সুখের বাগান।[৪৪]

অঞ্জনা সাহা (১৯৬১-২০২২) রচিত *একটি রক্ত গোলাপের জন্ম* কবিতায় বর্ণনা করা হয়েছে বিষাক্ত সাপের ছোবলে সোনালি আলোর চাঁদ নীল হলো বিষে। এখানে পাকিস্তানি অসুরদের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত বাংলাদেশ। রক্তখেকো পশুগুলো চেটে নিচ্ছে সন্তানের তরতাজা খুন। অসহ্য গোঙানির শব্দে ভারী হয়ে উঠেছে বাতাস। বাঙালির চোখে প্রতিশোধস্পৃহা। অভিশাপের অগ্নিদিন আসবেই একদিন। বুকের ভেতরে পুষে রাখা সবুজ গাছে অবশেষে ফুটে উঠবে একখানি জীবন্ত রক্তগোলাপ এমন আকাঙ্ক্ষা কবির।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা ও তর্জনী প্রসঙ্গ

সৈয়দ শামসুল হকের (১৯৩৫-২০১৬) মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী *আমার পরিচয়* কবিতায় বাংলাদেশের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর সমুজ্জ্বল অবস্থান নির্ণয় করে মূল্যায়ন করেছেন। বাঙালি চেতনার দিক থেকে অস্তিত্বের দিক থেকে, তারা বহু যুগের অর্জনের সাথে যুক্ত। বাঙালি জনগোষ্ঠী বহন করে চলছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান সংস্কৃতির উপাদান। এর সাথে মিশেছে আউল, বাউল, সংস্কৃতি আর ইতিহাসের নানা ঘটনা। অতীতের হাজারো চরণচিহ্ন এসে মিলেছে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে। এই কবিতায় ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদানকে প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে। যেমন: 'তিতুমীর' অত্যাচারী ইংরেজি ও হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেছেন তার প্রতীক, 'হাজী শরীয়ত' কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ছিলেন এবং ফরায়েজি ও ওহাবি আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন, 'ক্ষুদিরাম' ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। 'সূর্যসেন' আজীবন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলেন। 'অবনঠাকুর' বাংলাদেশের শিল্পকলা আন্দোলনের প্রতীক। 'চর্যাপদ' প্রাচীন বাংলার সাধারণ মানুষের প্রাণময় জীবনচিত্র। 'পালযুগ' চিত্রকলা এবং শিল্প-সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। 'পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার' প্রত্নতাত্ত্বিক

ঐতিহ্যের পরিচায়ক। 'বরেন্দ্রভূমে সোনামসজিদ' আসাধারণ শিল্পসৌন্দর্যের প্রতীক। 'সওদাগরের ডিঙার বহর' ব্যবসা বাণিজ্যের ঐতিহ্যের প্রতীক। 'সার্বভৌম বারভুঁইয়া' ঈসা খাঁর নেতৃত্বে মোগল শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রতীক। 'কৈবর্ত বিদ্রোহ' ১০৭৫ খ্রিস্টাব্দে কৈবর্ত সম্প্রদায়ের লোক দিব্যোক বা দিব্য মহীপালের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করেন তা বাঙালি জাতির বিদ্রোহের প্রতীক। 'রাষ্ট্রভাষার লালরাজপথ' ভাষা আন্দোলনের রক্তদানের প্রতীক। 'জয়বাংলা' মুক্তিযুদ্ধের সময়ে জাতীয় স্লোগান ও অসাধারণ এক প্রেরণাসঞ্চারী শব্দমালা। 'শেখ মুজিবুর রহমান' *মুক্তির প্রতীক, স্বাধীনতার প্রতীক, সমৃদ্ধির প্রতীক*। কবির ভাষায় -

এসেছি বাঙালি রাষ্ট্রভাষার লালরাজপথ থেকে
এসেছি বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর থেকে
আমি যে এসেছি জয় বাংলার বজ্রকণ্ঠ থেকে
আমি যে এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে।[৪৫]

নির্মলেন্দু গুণ রচিত কবিতা *স্বাধীনতা এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হল* এই কবিতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দান, বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভাষণ দিয়েছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুর ডাকে কারখানা থেকে কপালে কব্জিতে লালসালু বেঁধে এই মাঠে ছুটে এসেছিল লোহার শ্রমিক, লাঙল জোয়াল কাঁধে ঝাঁক বেঁধে উলঙ্গ কৃষক, প্রদীপ্ত যুবক, মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, করুণ কেরানি, নারী, বৃদ্ধ, বেশ্যা ভবঘুরে আর শিশু পাতাকুড়ানিরা দল বেঁধে। বঙ্গবন্ধু শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে জনতার মঞ্চে দাঁড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন– *এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম/এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।*[৪৬] কবি সংগ্রাম, স্বাধীনতা, বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা এই বিষয়গুলো অনাগত শিশু এবং আগামী দিনের কবির উদ্দেশ্যে বলেন। ফখরে আলম (১৯৬১-২০২২) *'একটি আঙুল'* কবিতায় একটি আঙ্গুলের কথা বলেছেন যা সূর্যকে আঘাত করে প্রভাত আসে এবং তর্জনীর শক্তি বাতাসে বাতাসে ভেসে পৌঁছে যায় লোকালয়ে ভূমি আরো উঁচুতে নক্ষত্রের কাছাকাছি নিয়ে যায় ফরসা হয় চারদিক, আঙুলের স্পর্শে বাঙালি মুক্ত হয় হাজার বছর। মূলত বঙ্গবন্ধুর ৭ ই মার্চের ভাষণে সেই আঙুল বা তর্জনী ছিল মুক্তির দিশারী। আমরা রক্ষা করতে পারিনি বঙ্গবন্ধুকে। সেই রক্তাক্ত আঙুলের শীর্ষে যে রক্তাক্ত বল এতদিন জঙে ঢাকা ছিল সেখানে আগুন রাঙা একটি গোলাপ ফুটে মুক্ত হাওয়ায় দুলছে। যেমন:

একটি আঙুল সূর্যকে আঘাত করে
সূর্য আঙুলের আঘাতে ফুঁসে ওঠে, ছড়ায় প্রভাত
শূন্যের ওপর এই তর্জনীর শক্তি
বাতাসে বাতাসে ভেসে পৌঁছে যায় লোকালয়ে
জাদুর আঙুল এই ভূমিকে আরো উঁচুতে
ঠিক নক্ষত্রের কাছে নিয়ে যায়
ফরসা হয় চতুর্দিক। আঙুলের স্পর্শে মুক্ত হয় হাজার বছর।[৪৭]

আমিনুর রহমান সুলতান (১৯৬৪) রচিত *পিতার ছবি* কবিতায় উপস্থাপিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গ। খাকি পোশাকিরা একদিন বাবার কাছে উত্তর চায় কোথায় রেখেছি ছবি, অথচ বাবা কন্যার ঘরে বইয়ের ভাঁজে ছবি লুকিয়ে রাখে। কন্যা ছবি হাতে ধুলো হাতে মুছে রেখে দেয়। এখন সেই ছবি পড়ার ঘরের দেয়ালে যা কন্যা খুঁজে পায় স্বপ্ন, সাহস, আর স্বপ্নের ছায়াতল।

এখানে পিতার লুকানো ছবি দেয়ালে শোভা পাওয়া ছবি যা বঙ্গবন্ধুর চিত্র কন্যার তথা নতুন প্রজন্মের সাহস আর স্বপ্নের প্রতীক। যেমন:

পিতা, তোমার ছবিটা এখন পড়ার ঘরের দেয়ালে
শোভা পাচ্ছে
ওই ছবিটায় আমি খুঁজে পাই স্বপ্ন
সাহস, স্বপ্নের ছায়াতল।[৪৮]

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু কবিতাটি কবি আমিনুর রহমান সুলতান রচনা করেন। নজরুলের কবিতায় বঙ্গবন্ধু পেয়েছিলেন জয় বাংলার প্রাণের ধ্বনি, এরপর সংগ্রামি পথ ৭ই মার্চ মুক্তিমন্ত্র, ছাব্বিশে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা, বীর মুক্তিযোদ্ধার অস্তিত্ব লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। অতঃপর অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে, বিপথগামীরা হত্যা করে পিতাকে। চেতনার আলোয় আঁধার কেটে কেটে বহমান চেতনার স্রোত চেতনার নদী হয়ে যায় নিরবধি। তাই বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন ও সাহস ভোর হয়ে জেগে আছে আমাদের মাঝে যেভাবে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধুর হুঙ্কারে নেমেছিল রণাঙ্গনে বীর মুক্তিযোদ্ধা। যেমন:

তোমার প্রজন্ম ঘুমিয়ে যায়নি পিতা
চেতনার আলোয় আঁধার কেটে কেটে
দাঁড়িয়েছে শুভ্র মেঘের হাওয়ায়
মায়ের সবুজ আঁচলে ফুটেছে রক্তজবা
পচাঁত্তরের গভীর ক্ষত আর শোক তাই পিতা
থামাতে পারেনি বহমান চেতনার স্রোত
চেতনার নদী মরে না
বয়ে যায় নিরবধি।[৪৯]

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সামাজিক চিত্র

রফিক আজাদ (১৯৪১-২০১৬) *যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ* কবিতাটি ২৩ মার্চ ১৯৮৫ সালে লিখেন। কবিতায় সমকালীন সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়– যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের চিত্র দেখতে পাই অসংখ্য বিধবা যারা কান্না করে, ইনভেলিড চেয়ারে উপবিষ্ট শশ্রুময় মুখ ইজ্জত হারানো বোন, ঘরে ফিরে না-আসা পুত্রের শোকে মূহ্যমান পিতা, আধাপোড়া বাড়ি, নিভন্ত উনুন, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়ানো তরুণ, ১৪৪ ধারা, মিছিল শ্লোগান, কাঁদানে গ্যাস ও লাঠিচার্জে ছত্রভঙ্গ সমাবেশ, রাজপথে গুলিতে লুটিয়ে পড়া রক্তাক্ত কিশোর, ছিনতাই, রাহাজানি, গণপিটুনিতে নিহত মানুষ, স্বার্থপরতা, ভূলুণ্ঠিত মূল্যবোধ আবার দেখা যায় শিশুহত্যা, নারীহত্যা, নেতৃহত্যা, রক্তচক্ষু ঘাতকের জিপ, রাজপথ ছেড়ে রাজনীতি প্রাসাদের আশ্রয় নেয়, দেউলিয়া অর্থনীতি স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক পর্যন্ত নিহত, একাত্তরে পরাজিত শত্রুরা সবাই ক্ষমতার বারান্দায়। বিদেশি ঋণের বেড়াজালে আবদ্ধ অর্থনীতি, রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানা চলে যাচ্ছে ব্যক্তি মালিকের হাতে, মুদ্রাস্ফীতি, বাজারে আগুন, মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে পীরের আস্তানা, মধ্যেপ্রাচ্যে নারী পাচার ইত্যাদি। একজন মুক্তিযোদ্ধা যেন মনে মনে তৈরি হন আরেকটি যুদ্ধের জন্য। কবির ভাষায়–

ক্ষুধার্ত, বেকার, কোণঠাসা মুক্তিযোদ্ধা ব্যর্থতায়
বোঝা পিঠে বয়ে ধুঁকে- ধুঁকে চলে রাজপথ,

হাড্ডিসার সমস্ত শরীরে তার শুধু দু'টি চোখ
দৃশ্যমান–ধ্বকধ্বক জ্বলে; আরেকটি যুদ্ধের জন্য
মনে-মনে তৈরি হয় মুক্তির সৈনিক... [৫০]

গোলাম কিবরিয়া পিনু (১৯৫৬) রচিত *সোনামুখ স্বাধীনতা* কবিতায় বর্ণিত হয়েছে, অস্ত্রধারী দুর্বৃত্ত সৈনিক ষোলজন একজন ব্যক্তিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যায় অন্ধকারে যেখানে পোড়ামাটি এবং বধ্যভূমি তৈরি করা হয়েছে এবং বন্দি হয়নি; সে সন্ধিও করেনি কিন্তু গুমখুনে চিরঘুম দিয়েছে। জলাঞ্জলি দিল ঐ ব্যক্তির স্বাধীনতা সোনামুখ স্বাধীনতা। রেজাউদ্দিন স্টালিন 'এক মুক্তিযোদ্ধার মহত্তম ক্ষমা' কবিতায় বর্ণনা করা হয়েছে এক মুক্তিযোদ্ধার প্রতিবাদী চেতনা এবং মৃত্যুর মধ্যে তার মহত্তম ক্ষমার চিত্র। পাকিস্তানিদের নির্যাতন আর হত্যার কথা শুনে মুক্তিযোদ্ধা বলে উঠলেন পাকিস্তানিদের কোন ক্ষমা নেই। বাংলাদেশ নামক মাথার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করে অস্ত্র দেখিয়ে বলেছিলেন, এবার জয় হবে আমাদের। ঈশা খার তরবারির মতো তীক্ষ্ণ আর তিতুমীরের কেল্লার মতো দৃঢ় সেই মুক্তিযোদ্ধা ইউসুফ ঘৃণাভরে সমস্ত শত্রুকে ক্ষমা করে দিয়েছিল যখন তিনি নাভারনের এক কবরগাহের শয্যায়। ইউসুফকে দেখে উজ্জীবিত হয়েছিলেন শত ইউসুফ। অথচ আজ ইউসুফের স্ত্রী নিখোঁজ, ১৪ বছরের ছেলেটি এক সরাইখানার আদেশের অধীন অথচ ইউসুফ যেন নীরব এক মুক্তিযোদ্ধার মহত্তম ক্ষমা। মুক্তিযোদ্ধার ভালবাসার মা বাংলাদেশের কোনো প্রতিবাদ নেই এমন প্রতিরূপ উপস্থাপিত হয়েছে কবিতাটিতে। যেমন:

তা হলে ইউসুফের নীরবতাকে আমরা কি বলব?
এক মুক্তিযোদ্ধার মহত্তম ক্ষমা,
যার ভালবাসার বিনিময়ে তার মায়ের কোনো
প্রতিবাদই নেই? [৫১]

বায়তুল্লাহ কাদেরী (১৯৬৮) রচিত *প্রজন্ম লোহিত* কবিতায় বর্ণিত হয়েছে পতাকার মতো সবুজ রক্তিম দেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল অথবা নিজেই পুড়ে পুড়ে লাল হয়েছে। যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশ হতাশায় ক্লান্তিতে, আগুনে অভিমানে প্রতিবন্ধকের রূঢ় চাপে সবুজ রক্তিম না হয়ে জ্বলজ্বলে লাল হয়েছে গ্রহটি। ফ্রয়েডহীন (১৮৫৬-১৯৩৯) যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত সবাই যেন মানানসই। কবির ভাষায়–

আর তো হয় না যুদ্ধ, সকলেই কেমন মানানসই, যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত
হাসে, গল্প করে ধোঁয়া ছাড়ে আলাদা সাইলেন্সারে,
কিছুটা পেট্রোল মিশ্রিত, কিছুটা ডিজেল মিশ্রিত কিছুটা গ্যাসীয়
কিছুটা অবদমিত অথচ ফ্রয়েডহীন, বিকারের ধারে কাছে নেই
হতাশা আসে না, ক্লেদে-ক্লেদে ঘুরে বেড়ালেও লাগে না কাদার চিহ্ন
যন্ত্রের মিথুনরত শুভ্র হংস যেন অন্য বুদ্যোঅঁর। [৫২]

তপন বাগচী (১৯৬৮) *বিজয়ের ঘড়া* কবিতায় উপস্থাপন করেছেন মুক্তির উল্লাসে আজ বিজয়ের ঘড়া ভরে গেছে। রক্তের দামে কেনা বাংলায় তৃপ্তির হুল্লোড়, দাসত্বের চিরমুক্তি, অধীনের অনন্ত উড়াল, আমরা সব পেয়েছি হয়ত সব পূর্ণতা পেয়েছে গোপনে, তবুও মুক্তির আড়ালে অনেক কিছু না পাওয়ার বেদনার ইঙ্গিত রয়েছে কবিতাটিতে। যেমন:

মুক্তির উল্লাসে আজ ভরে ওঠে বিজয়ের ঘড়া
অনেক রক্তের দামে পান করি তৃপ্তের হুল্লোড়।
... ...
আমাকে দিয়েছে ভরে দুই হাতে গোপন পূর্ণতা
নীরব বেদনারাশি বুঝে গেছে মুক্তির ক্ষমতা।[৫৩]

দিলরুবা শাহাদৎ (১৯৫৭-) রচিত *যুদ্ধের কবিতায়* বর্ণিত হয়েছে যার যা কিছু আছে তাই (যেমন: লাঠি, বেয়নেট, বন্দুক) নিয়ে শোষিত সমাজের মানুষের মুখে হাসি ফিরিয়ে আনার জন্য যুদ্ধে গেল এবং বিজয়ী বেশে ফিরে এলো যেমন মরুভূমির বালুকারাশিতে ভিজিয়ে দেয় রিম ঝিম বৃষ্টি। এই যুদ্ধে আবাল বৃদ্ধ বণিতা ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। যেমন:

শোষিত সমাজের মানুষের মুখে হাসি
ফিরিয়ে আনার জন্য তারা
যুদ্ধে গেল
লাঠি, বেয়নেট, বন্দুক
যার যা ছিল তাই নিয়ে তারা
যুদ্ধে গেল।[৫৪]

বাদল ঘোষ রচিত *মুক্তিযুদ্ধের কবিতায়* বর্ণনা করা হয়েছে শকুনের উন্মুক্ত থাবায় ভয়ার্ত কাপে তিনটি মুখ এবং তারা হলেন চাষী সলিম, শ্যাম, মাইকেল বা সুনীল বড়ুয়ার বা সেই প্রিয় মুখ কন্যা জায়া জননী পেঁচার চোখে ভয়াবহ অবিশ্বাস আর ক্রুর নিষ্ঠুরতা নিয়ে চাপ চাপ জমাট রক্তে মানচিত্রের সীমারেখা আঁকা হয়। এখানে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার চেতনায় জাগ্রত তিনটি প্রিয় মুখের চিত্র অংকিত হয়েছে।

হাসান আল আবদুল্লাহ রচিত *বঙ্গীয় উপনিষদ* কবিতায় দেখা যায় কৃষক দু'বেলা খেতে পায় না আরশের দিকে চোখ তুলে কিছু চায়, তখন আকাশ কাঁপানো শব্দ ওঠে 'ব' যা বায়ান্ন, বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশকে বোঝায়। কবির ভাষায়:

বঙ্গীয় ব-দ্বীপ থেকে আওয়াজ ওঠে: ব ব ব
বায়ান্ন, বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ।[৫৫]

মাকিদ হয়দারের (১৯৪৭-) কবিতায় প্রিয়ার কাছে নলিনীমাধব বিপন্ন যুবক বলে সম্বোধন করা যুবকের বর্ণনা এসেছে যার জাগরণের মধ্যে সবসময় একটা কালো সাপ, স্বপ্নের মধ্যেও দুঃস্বপ্ন তাড়িয়ে ফেরে। যুদ্ধে পরাজিত পিতার দামাল কিশোর, স্কুল পালানো গোঁয়ার গোবিন্দ পিতামহের কাছে উপদেশ পাওয়া যেন নলিনীমাধব তৃষ্ণায় জলের জন্য, সুনীল জলাশয়ের কাছে না তার ছায়া দেখা দিলে জলে হবে পলাতক থাকবে আকণ্ঠ পিপাসা। নলিনীমাধব রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীর যুগল চোখ ফাঁকি দিয়ে প্রিয়াকে ছুঁয়ে দেখার জন্য নিঃশব্দে পালিয়ে আসে এবং প্রিয়ার কাছে পবিত্র আশ্রয় চায়, ছুঁয়ে দেখতে চায় মুখ, পবিত্র শরীর। এখানে কবি প্রিয়াকে 'জন্মভূমি' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। যেমন:

মানুষের রক্তের ভেতরে জেগে ওঠে আদিম বিপ্লব
শুধু তোমাকে একবার নিবিড় করে পাবার জন্য
দেখ তো আমায় আগের মতো চিনতে পার কি না
আমি সেই দোহার পাড়ার নলিনীমাধব [৫৬]

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর রাজনৈতিক অঙ্গনে কালো অধ্যায় সূচিত হয় এবং তা চলমান থাকে এরশাদের শাসন পর্যন্ত। গণতন্ত্র আদায়ের লক্ষ্যে নূর হোসেন নব্বইয়ের গণ-আন্দোলনকে বেগবান করার চেতনার প্রতীক। নূর হোসেন সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মন্তব্য–

> সামনে স্লোগান দিতে দিতে এক তরুণ এগিয়ে যাচ্ছে। লম্বা কদম, দোহারা শরীর, মাথাভরা চুল, কোমল কপোল ছাপিয়ে দুটি শান্ত চোখ এবং বাংলার শ্যামল মাঠের মত গায়ের রং। রক্ত জবার মতো লাল রঙের শার্টটি কোমরে বাঁধা। বুকে-পিঠে সাদা রঙের কালিতে লেখা দুটি স্লোগান–বুকে-' স্বৈরাচার নিপাত যাক', পিঠে 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক'। আমি দারুণভাবে চমকে উঠলাম। ধীর পদক্ষেপে স্লোগান দিতে দিতে এক সময় থেমে আমাকে লেখাগুলি দেখালো সে। শিল্পির তুলিতে আঁকা লেখা।...মনে পড়ে আমি তাকে বলেছিলাম–'জামাটা গায়ে দাও, একি সর্বনাশ করছো, ওরা যে তোমাকে গুলি করে মারবে।' নূর হোসেন মাথাটা এগিয়ে দিল আমার কাছে । বলল– *জান দিয়া দিমু আপা, আপনে শুধু মাথায় হাত বুলাইয়া দ্যান।* আমি ভীষণভাবে তার কথার প্রতিবাদ *করলাম–'না, জীবন দেবে ক্যানো, আমি আর শহীদ চাই না, আমি গাজী চাই।'* ওকথা আর মুখেও আনবে না। জামাটা গায়ে দাও। ওরা তোমাকে গুলি করবে বলে নূর হোসেনের মাথা ভরা ঝাঁকড়া কালো চুলে হাত বুলিয়ে দিলাম। চুলগুলি মুঠো করে ধরে আবার বোনের দাবি নিয়ে অনুরোধ করলাম জামাটা পরতে। আমার হাত ধরে বেশ কিছুক্ষণ নূর হোসেন গাড়ির পাশে পাশে হাঁটল। তারপর কখন যে জনতার স্রোতে হারিয়ে গেল।[৫৭]

গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ গেল নূর হোসেনের, তাঁকে নিয়ে রচনা করলেন মহাদেব সাহা (১৯৪৪-) *নূর হোসেন*, নির্মলেন্দু গুণ *নূরহোসেন* ও কবি শামসুর রাহমান *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়* কবিতা। অবশ্য কবি শামসুর রাহমান কবিতাটি লিখেন ১৯৮৭ সালে। কবির ভাষায়–

উদ্যম শরীরে নেমে আসে রাজপথে, বুকে–পিঠে
রৌদ্রের অক্ষরে লেখা অনন্য শ্লোগান
... ...
নূর হোসেনের বুক নয় বাংলাদেশের হৃদয়
ফুটো করে দেয় ; বাংলাদেশ
বনপোড়া হরিণীর মতো আর্তনাদ করে, তার
বুক থেকে অবিরল রক্ত ঝরতে থাকে, ঝরতে থাকে।[৫৮]

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে নূর হোসেন ছিলেন অগ্রদূত। মুক্তিযুদ্ধের গবেষক আমিনুর রহমান সুলতান বলেন, "নূর হোসেন একটি গোলাপ হয়ে ফুটে উঠেছে, যে গোলাপের শরীর বুলেট বৃষ্টিতে ঝাজরা অথচ লক্ষকোটি রক্তবীজ মুহূর্তেই সারা দেশের মাটিতে মুক্তিকামী মানুষের মনে ছড়িয়ে দিয়ে যায়।[৫৯]

তপন বাগচী রচিত *একবিংশী* কবিতায় দেখা যায় পৃথিবীর মধ্যে একটি মানচিত্রের অধিকার আদায় করতে গিয়ে জীবন বাজি রেখে বিজয়ের হাসি অর্জন করেছি, অর্জন করেছি ত্যাগের

মহত্ত্বে প্রিয় স্বাধীনতা কিন্তু নীল চাবি বা অপশক্তি দরোজায় দোলে আমাদের অস্তিত্বকে ক্রমশ বিবর্ণ করেছে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় কবিতাটিতে। যেমন–

নীল চাবি তবু কালো দরোজায় দোলে।
ত্যাগের মহত্ত্বে ধোয়া প্রিয় স্বাধীনতা
ক্রমশ বিবর্ণ আজ অস্তিত্বে কোষে।[৬০]

তপন বাগচীর *অসুন্দর নাচে* কবিতায় বর্ণনা করা হয়েছে রক্তে কেনা বাংলাদেশ, চারদিকে অসুন্দর নাচে, হুক্কাহুয়া রব, জলজ্যান্ত বাঘ ও কুমীরের হানা, জলে ও ডাঙায় বহুমুখী শ্বাপদের ভিড়। নির্ভীক কবির আকাঙ্ক্ষা নিরস্ত্র হলেও তার চেয়ে বেশি তীক্ষ্ণ ফলা কলমের নিব পৃথিবীকে সজীব করে তুলতে পারে। যেমন:

রক্তকেনা বাংলাদেশ, অসুন্দর নাচে তার ঘাড়ে
... ...
আমি কি নিরস্ত্র? তবে নিত্যপ্রিয় কলমের নিব
আজ হোক তীক্ষ্ণ ফলা, পৃথিবীকে করুক সজীব।[৬১]

তপন বাগচী রচিত *প্রেরণা* কবিতায় মত্ত আড়িয়াল খার বুকে যেমন জেগে ওঠে জীবনবিনাশী চর কীর্তিনাশারাও যেন বুড়ো হয়ে গেছে ঠিক তেমনি পতাকার সবুজ জমিন বিবর্ণ ধূসর এবং একুশের সোনামুখী চুলে আজ পৌঢ়ত্বের ছায়া। দেশ জুড়ে সন্ত্রাসের মহোৎসব এবং অন্ধকার নেমে পড়েছে। কবির ভাষায়––

ধ্বংস যেন যৌবনের অনিবার্য ক্রীড়া
অন্ধকার আজ বড় জনপ্রিয় ছবি
আদিমতা আমাদের রক্তজ প্রেরণা।[৬২]

মাকিদ হায়দার *প্রিয় রোকোনালী* কবিতায় বর্ণনা করা হয়েছে কবির প্রিয় মামা যে কোনো গ্রামে মুক্তিযোদ্ধার সংবাদ পেলেই বন্ধুদের নিয়ে যেতেন এবং মুক্তিযোদ্ধার রক্তাক্ত শার্ট এনে দেখিয়ে বলতেন এই যে তোমাদের মুক্তিযুদ্ধ। কবি অনেকদিন পরে মাতুলের গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করতে গিয়ে নামকরণ দেখেন মাতুলের নামে এবং মাতুলের বাড়িটির শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। উদ্বোধনকালে বালকেরা যখন *আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি বলে* এবং জাতীয় পতাকা উপরের দিকে তুলতে লাগল তখন মনে হল আমার সাদা পাঞ্জাবির ওপর কোথা থেকে এক ফোটা রক্ত এসে পড়ল। এখানে রাজাকার *রোকোনালীদের* প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন কবি। যেমন–

এই যেমন আমার ছোট মামা রোকনালীর,
যে কোনো গ্রামে, মুক্তিযোদ্ধা কোনো তরুণের সংবাদ পেলেই
তার বন্ধুদের নিয়ে যত গভীর রাতেই
হোক না কেন, তিনি
যাবেন–যাবেনই
ফিরে আসার সময় মুক্তিযোদ্ধা তরুণের
রক্তাক্ত শার্ট এনে দেখিয়ে বলতেন,
এই যে তোমাদের মুক্তিযুদ্ধ।[৬৩]

সৌমিত্র দেব (১৯৭০-) রচিত *আমি সেই মাতাল যুবক* কবিতায় রক্তচোষা জোঁক গদিতে বসেছে মৌলিক চাহিদা, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, বেকার সমস্যার সমাধান করছে না, সুষম বণ্টন করছে না। স্বাধীনতা বিরোধীদের সাথে আঁতাত করলে কবির উচ্চারণ–

স্বাধীনতা বিরোধীদের সাথে যদি করেছো আঁতাত মনে রেখো
জানোয়ার, পাল্টে যাবে তোমার হালত
গণজোয়ারের মুখে ব্যর্থ হবে সকল আঘাত
তুমি হবে ইবলিস-গণশত্রু-কপালে লানত।[৬৪]

স্বাধীনতা পরবর্তী মুক্তিযুদ্ধের কবিতা চেতনার জাগরণকে ছড়িয়ে দেয় নতুন প্রজন্মের কাছে। পাকিস্তান সরকারের রাজনৈতিক ব্যর্থতা, অর্থনৈতিক অসম বণ্টন, সাংস্কৃতিক আধিপত্য ভেঙে যাওয়া অন্যদিকে ভাষা-আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা, ছাত্রদের ১১ দফা, ৭ই মার্চের ভাষণ, স্বাধীনতার ঘোষণা, কবিদের ধারালো কবিতা, বুদ্ধিজীবীগণের ঐকমত্যে পৌঁছানো, সাংস্কৃতিক শিল্পীগোষ্ঠীর সম্মিলিত আন্দোলন, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ৯ মাস সশস্ত্র সংগ্রাম, বেতার শিল্পীগোষ্ঠীর কণ্ঠ-সংগ্রাম প্রভৃতির মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় মহান স্বাধীনতা। মুক্তিযুদ্ধের গৌরব, চেতনা, অহংকার এবং পরিচয়সূত্র এই কবিতা। শহিদের স্মৃতি, নির্যাতন, বোনের সুতীব্র হাহাকার, গণহত্যা প্রভৃতি প্রসঙ্গ উঠে এসেছে কবিতাগুলোতে। স্বাধীন বাংলাদেশে কবিরা তাঁদের অসংখ্য কবিতায় লিখেছেন মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী জনতার প্রত্যাশা-প্রাপ্তি, আনন্দ ও বেদনার গাঁথা। মহান মুক্তি-সংগ্রাম একদিকে যেমন বাঙালি জাতিকে দিয়েছে অপার সম্ভাবনার উদার উঠান, তেমনি যুদ্ধ-পরবর্তী সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান মানুষকে নানাভাবে বিপন্ন করেছে। এসবের বাস্তব ছবি হয়ে উঠেছে কবিতা।

তথ্যসূচি:

---

১ হিমেল বরকত, *সত্তরের দশকের কবিতার গাঠনিক প্রবণতা*, *উলুখাগড়া*, (সাহিত্য-সংস্কৃতিক বিষয়ক ত্রৈমাসিক), সংখ্যা: ২২, জানুয়ারি-মার্চ -২০১৭, পৃ. ১৭৫

২ ফয়জুল আলম পাপ্পু সম্পা., *মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত কবিতা*, (ঢাকা: হাতে খড়ি, ২০১২), পৃ. ৬৯

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

৪ আবিদ আনোয়ার, *'প্রতিরোধ'*, আবুল হাসনাত সম্পা. *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা*, (ঢাকা: অবসর, ২০১৮), পৃ. ২৭৩-২৭৪

৫ শিহাব সরকার, *টুকরো টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১

৬ হালিম আজাদ, *মনে আছে কি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৭

৭ নাসিমা সুলতানা, *রণক্ষেত্র ও সম্পূর্ণ মানুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০

৮ সোহরাব হাসান, *বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

৯ আবুল হাসান রচনাসমগ্র, *উচ্চারণগুলি শোকের*, *রাজা যায় রাজা আসে*, (ঢাকা : বিদ্যা প্রকাশ, ষষ্ঠ প্রকাশ, ২০১৮), পৃ. ২৯

১০ আবিদ আজাদ, *গ্রেনেড*, আবুল হাসনাত, *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা*, পৃ. ২৪৬

১১ শিহাব সরকার, *জ্যোর্তিময় তর্জনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

১২ শিহাব সরকার, *নজরুলকে মনে পড়ে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
১৩ ত্রিদিব দস্তিদার, *যুদ্ধক্ষেত্রে একটি কবিতা*, পৃ. ২৬৪
১৪ ত্রিদিব দস্তিদার, *তুমি পিতৃ বীজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪
১৫ বিমল গুহ, *একাত্তরের কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭
১৬ কামাল চৌধুরী, *সেই মুখখানি কবিতার বড় ছিল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪
১৭ হাসান হাফিজুর রহমান, *গেরিলা*, যখন উদ্যত সঙ্গীন, *কাব্যসমগ্র*, (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০১), পৃ. ১৮৩
১৮ হাসান হাফিজুর রহমান, *শত্রুর লাশ চাই*, যখন উদ্যত সঙ্গীন, *কাব্যসমগ্র*, পৃ. ১৫৭
১৯ রফিকউল্লাহ খান, *হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতা প্রসঙ্গে*, *কাব্যসমগ্র*, *হাসান হাফিজুর রহমান*, (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০১), পৃ. ১০
২০ ফয়জুল আলম পাপ্পু, *মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত কবিতা*, (ঢাকা: হাতে খড়ি, ২০১২), পৃ. ৭৬-৭৭
২১ bn.wikipedia.org./wiki/ টিক্কা খান
২২ আবিদ আনোয়ার, *দ্রব্যগুণ*, আবুল হাসনাত, *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা*, পৃ. ২৭৪
২৩ সৈয়দ হায়দার, *কেন মুক্তিযুদ্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২
২৪ ত্রিদিব দস্তিদার, *বোবা মেয়েটিকে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬
২৫ নির্মলেন্দু গুণ, *নির্বাচিতা*, *না প্রেমিক না বিপ্লবী* (১৯৭২), *আগ্নেয়াস্ত্র*, (ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ২০১৬), পৃ. ৪৮
২৬ মুহম্মদ নূরুল হুদা, *শান্তিবাড়ি*, (ঢাকা: অনন্যা, ২০১৬), পৃ. ৫৬
২৭ ত্রিদিব দস্তিদার, *'ব্লাকবোর্ড'*, *সত্তর দশকের কবিতা অজস্র আগুনের ফুল*, (স) আলী রীয়াজ কামাল চৌধুরী, আর্কিড, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৫৮
২৮ মোহন রায়হান, *সবুজ চাদরে ঢাকা রক্তাক্ত ছুরি*, আবুল হাসনাত, *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা*, পৃ. ৩৩৩-৩৩৪
২৯ রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাতাসে লাশের গন্ধ*, (ঢাকা: বুকস ফেয়ার, ২০১৩), পৃ. ১৪
৩০ মাহবুব হাসান *'বিজয় আমার স্বাধীনতা'* আবুল হাসনাত, *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা*, পৃ. ২৩১
৩১ মিনার মনসুর, *প্রিয় বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩
৩২ রবীন্দ্র গোপ, মুক্তিযুদ্ধ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০
৩৩ শিহাব সরকার, *তিন কবরে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮
৩৪ শহীদ কাদরীর কবিতা, *তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা*, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৬), পৃ. ৬৫
৩৫ নির্মলেন্দু গুণ, *নির্বাচিতা*, *না প্রেমিক না বিপ্লবী*, *স্বাধীনতা উলঙ্গ কিশোর*, (ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ২০১৬), পৃ. ৬০
৩৬ আবিদ আজাদ, *'এখন যে কবিতাটি লিখব আমি'*, আবুল হাসনাত, *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা*, পৃ. ২৪৫
৩৭ নাসির আহমেদ, *'বিজয়ের বোন কড়া নেড়ে যায়'*, আবুল হাসনাত, *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা*, পৃ. ৩০১
৩৮ কামাল চৌধুরি, *ক্রাচের যুবক*, আবুল হাসনাত, *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা*, পৃ. ২৯৫
৩৯ হাসান হাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র: দ্বিতীয় খণ্ড*, (ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৭৮), পৃ. ৮২০
৪০ চন্দন চৌধুরী সম্পা., *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা* (ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০০৯), পৃ. ৩৩
৪১ মুহম্মদ নূরুল হুদা, *শান্তিবাড়ি*, (ঢাকা: অনন্যা, ২০১৬), পৃ. ৫৬
৪২ খোন্দকার আশরাফ হোসেন, *বাউসী ব্রিজ ৭১*, আবুল হাসনাত, *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা*, পৃ. ২২২
৪৩ আমিনুর রহমান সুলতান, *লোনার পতাকা*, ফয়জুল আলম পাপ্পু সম্পাদিত *'মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত কবিতা'*, (ঢাকা: হাতে খড়ি, ২০১২), পৃ. ৯১
৪৪ হুমায়ুন কবির, *আমার ভাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১
৪৫ সৈয়দ শামসুল হক, *'শিশু-কিশোর কবিতাসমগ্র'*, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৭), পৃ. ১৩৫
৪৬ নির্মলেন্দু গুণ, *'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হল' চাষাভূষার কাব্য*, *নির্বাচিতা*, (ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ২০১৬), পৃ. ১৫৪
৪৭ ফখরে আলম, *একটি আঙুল*, *ফয়জুল আলম* পাপ্পু সম্পাদিত *'মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত কবিতা'* পৃ. ২২৬
৪৮ আমিনুর রহমান সুলতান, *৭ই মার্চের তর্জনী*, (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০২০), পৃ. ৩৭

৪৯ আমিনুর রহমান সুলতান, *জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু, ৭ই মার্চের তর্জনী*, পৃ. ৩৭
৫০ যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ, *খুব বেশি দূরে নয়*, *কবিতাসমগ্র*, রফিক আজাদ (ঢাকা: অনন্যা, মার্চ ২০১৬), পৃ.৩২৫-৩২৬
৫১ রেজাউদ্দিন স্টালিন, *এক মুক্তিযোদ্ধার মহত্তম ক্ষমা*, আবুল হাসনাত, *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা*, পৃ. ৩২৪
৫২ বায়তুল্লাহ কাদেরী, *'প্রজন্ম লোহিত ' মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত কবিতা*, ফয়জুল আলম পাপ্পু সম্পাদিত, পৃ. ২৪১
৫৩ তপন বাগচী, *বিজয়ের ঘড়া*, *নির্বাচিত ২০০ কবিতা*, (ঢাকা: বিভাস: ফেব্রুয়ারি ২০২০), পৃ. ১২৬-১২৭
৫৪ দিলরুবা শাহাদৎ, *যুদ্ধের কবিতা*, *বাংলাদেশের তিন দশকের কবিতা* (১৯৭১-২০০০), সম্পা. রফিকউল্লাহ খান, (ঢাকা: একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ২০০৫), পৃ. ৫৯২
৫৫ হাসান আল আবদুল্লাহ, *'বঙ্গীয় উপনিষদ*, *নব্বই দশকের নির্বাচিত কবিতা*, রবিউল মানিক, (ঢাকা: বিভাস, ২০১৪), পৃ. ৯০
৫৬ মাকিদ হায়দার, *জন্মভূমি*, *মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত কবিতা*, ফয়জুল আলম পাপ্পু সম্পাদিত পৃ. ২৬১
৫৭ শেখ হাসিনা, *শেখ মুজিব আমার পিতা*, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী: নবম মুদ্রণ, মার্চ ২০১৯), পৃ. ৯৪
৫৮ শামসুর রাহমান, *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়*, (ঢাকা: বিউটি বুক হাউস, ৯১), পৃ. ৯
৫৯ আমিনুর রহমান সুলতান, *বাংলাদেশের কবিতা ও উপন্যাস: মুক্তিযুদ্ধের চেতনা*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬), পৃ. ৯৯
৬০ তপন বাগচী, *একবিংশী*, *নির্বাচিত ২০০ কবিতা*, পৃ. ১৬
৬১ তপন বাগচী, *অসুন্দর নাচে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
৬২ তপন বাগচী, *প্রেরণা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
৬৩ মাকিদ হায়দার, *প্রিয় রোকোনালী*, *মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত কবিতা*, ফয়জুল আলম পাপ্পু সম্পাদিত, পৃ. ২৬৩
৬৪ সৌমিত্র দেব *'আমি সেই মাতাল যুবক'*, *নব্বই দশকের নির্বাচিত কবিতা*, রবিউল মানিক, পৃ. ৯০